রাজমোহনের স্ত্রী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুবাদ: সজনীকান্ত দাস

সম্পাদনা: সৌরভ দাশঠাকুর

রাজমোহনের স্ত্রী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুবাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ঈষ্টার্ণ পাবলিশার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

উপন্যাস হিসাবে 'রাজমোহনের স্ত্রী'র (*Rajmohan's Wife*) মূল্য যাহাই হউক ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য। বাংলাদেশের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের প্রথম উপন্যাস বাঙালী পাঠকের কাছে চিরদিনই কৌতুক ও কৌতূহলের বিষয় হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৩ বৎসর ৮ মাস বয়সে) কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' সর্ব্বপ্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় দুই বৎসরকাল ওই পত্রিকাতেই নানাবিধ গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। 'তথা মানস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হইয়াছিল। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওই সালে বঙ্কিমচন্দ্র কদর্য্য বাংলা গদ্যে ওই পুস্তকের এক পৃষ্ঠা ভূমিকা মাত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৫৩ হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্য কোন সাহিত্যকর্ম্মের ইতিহাস আমরা অবগত নই। এই কালের মধ্যে তিনি এণ্ট্রান্স হইতে বি. এ. পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট হইতে ডেপুটিগিরি চাকুরিতে বহাল হইয়া যশোহর-মেদিনীপুর-খুলনা-বারুইপুর করিয়া ফিরিতেছেন। এই সময়ে তিনি খাঁটি ইংরেজীনবিশ; মাতা বঙ্গবীণাপাণির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বিমাতার সেবায় মগ্ন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের প্রথম উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় লিখিত *Rajmohan's Wife* ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতে থাকে। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' সম্পূর্ণ হইলেও এই পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

কারণ অনুমান করা যায় যে, মাতৃভাষার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ এই বৎসরেই প্রবল হইয়া থাকিবে। তিনি সম্ভবত ইংরেজীতে মৌলিক সৃষ্টির আশা পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নিজের রচিত ইংরেজী উপন্যাসেরই অনুবাদ করিয়া তিনি এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতে চাহিলেন। এক অধ্যায় দুই অধ্যায় করিয়া মাত্র সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত (পংক্তি কয়েক বাকি ছিল) অনুবাদ করিয়া তিনি আর পারিলেন না। তাঁহার মত মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা যাঁহার, তিনি অনুবাদ বা অনুসরণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, তা সে হউক না নিজেরই অনুসরণ। সুতরাং 'রাজমোহনের স্ত্রী'র বঙ্কিমকৃত বাংলারূপ আর প্রকাশ পাইল না, প্রায় সূত্রপাতেই বিনষ্ট হইল।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেই পাতা কয়টা রহিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দপ্তর ঘাঁটিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই খণ্ডিত অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেন। শচীশচন্দ্র যদিও জানিতেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র একদা *Rajmohan's Wife* লিখিয়াছিলেন * তথাপি কেন জানি না পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সেটি যে ওই *Rajmohan's Wife*এর অনুবাদ তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই, সেই পাণ্ডুলিপিতে রাজমোহন ও রাজমোহনের স্ত্রীর বারংবার উল্লেখ

* "বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন "Rajmohan's wife" নামক গল্প ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি "Rajmohan's wife" ও "Adventures of a young Hindu" ছাড়িয়া "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী' তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০৮। শেষের সংবাদও ঠিক নহে, *Rajmohan's Wife* 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' সম্পূর্ণ বাহির হইয়াছিল। শেষোক্ত পুস্তক *Adventures of a Young Hindu*র কোনও সন্ধান আজও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

থাকা সত্ত্বেও। যাহা হউক, তিনি সেই পাণ্ডুলিপিটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাসের সূত্রপাত কল্পনা করিয়া নিজের খেয়ালমত তাহা সম্পূর্ণ করেন এবং 'বারি-বাহিনী' নাম দিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র-অনূদিত প্রথম সাত পরিচ্ছেদ, নয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া বাহির হয়। *Rajmohan's Wife*এর শেষাংশের সহিত 'বারি-বাহিনী'র শেষ অংশের কোনই মিল নাই। শচীশচন্দ্র পুস্তকের "ভূমিকা"য় লেখেন—

পরমারাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে—১৩০০ বঙ্গাব্দে—এই আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ও শিষ্য আজ তাহা ছাব্বিশ বৎসর পরে শেষ করিল।

'বঙ্কিম-জীবনী'তেও "জীবনের শেষ কয়েক বৎসর" অধ্যায়ে শচীশচন্দ্র লিখিয়াছেন:

কিছু করেন নাই বলিলে ঠিক চলিবে না। তিনি একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে না হইতে কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গেল। তাহার কয়েক বৎসর পরে উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৫২

এইরূপ ভ্রমের প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' হইতে *Rajmohan's Wife* তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে ইহা আবিষ্কার করেন ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র যে যে সংখ্যায় প্রথম তিন অধ্যায় বাহির হইয়াছিল, সেই সেই সংখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই বলিয়া 'বারি-বাহিনী' হইতেই প্রথম তিন অধ্যায়ের অনুবাদ দিয়া পুস্তক সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম তিন অধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ। পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনাবলীর ইংরেজী খণ্ডে *Rajmohan's*

Wife এবং "বিবিধ" খণ্ডে 'বারি-বাহিনী' হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাত পরিচ্ছেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

*Rajmohan's Wife*এর সংস্কৃত অনুবাদ (চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে) 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাঘ হইতে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্য্যন্ত ১৩ মাস ধরিয়া বাহির হয়। এই পুস্তকে 'বারি-বাহিনী'র সহায়তায় প্রথম তিন পরিচ্ছেদও যুক্ত হইয়াছে। এই তিন পরিচ্ছেদে কোটেশন-মার্কা দেওয়া অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে সপ্তম পরিচ্ছদের অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই পুস্তকে তাহা ব্যবহার করি নাই, কারণ আমরা মূল ইংরেজীরই যথাযথ অনুসরণ করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা শচীশচন্দ্র 'বারি-বাহিনী'তে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকে তাহারই একটি প্রতিলিপি দিলাম।

'রাজমোহনের স্ত্রী'র বঙ্কিম-কৃত অনুবাদ-অংশের ভাষা লইয়া কিছু আলোচনা আবশ্যক, কারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই অনুবাদটুকু বঙ্কিমের ভাষার ক্রমপরিণতির পরিচয় বহন করিতেছে। এই কাঁচা-পাকা ভাষার সংমিশ্রণ দৃষ্টে শচীশচন্দ্রের মনেও সংশয় জাগিয়াছিল। সেই কারণেই তিনি 'বারি-বাহিনী'র "ভূমিকা"য় লিখিয়াছিলেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাধারণ ভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক অভিনব ভাষায় এই পুস্তকখানির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আসলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাববর্জ্জিত ভাবে এই কয়টি পৃষ্ঠাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা-গদ্যরচনা। ইতিপূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার যে গদ্যরচনা বাহির হইয়াছিল, তাহাকে অপাঠ্য গদ্য বলিলে অপরাধ হয় না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' অনুবাদ করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর —প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' ও

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' তখন প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরী-রীতি ও আলালী-রীতির পার্থক্য তিনি ধরিতে পারিয়াছেন এবং নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে বুঝিয়াছেন যে, এই দুই রীতির সমন্বয় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষার উন্নতি সম্ভব নহে। তিনিই এই সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট হইলেন। 'রাজমোহনের স্ত্রী'র তৎকৃত অনুবাদে এই দুই রীতির দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। বিদ্যাসাগরী-রীতির দৃষ্টান্ত—

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানীসন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক।—ইত্যাদি। প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এবং ইহারই পাশে আলালী-রীতির দৃষ্টান্ত—

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজিনবিশ ইয়ার বক্‌শিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল। ইত্যাদি। ঐ।

প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের আদিপর্ব্বের সমাপ্তি এবং যথার্থ বঙ্কিম-প্রতিভার অভ্যুদয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে (১৮৬৫) সার্থকভাবে এই ভাষাসমন্বয়ের সূত্রপাত দেখিতে পাই। 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রাজমোহনের স্ত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বারিবাহিনী

মধুমতী নদীর তীরে রাধাগঞ্জ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের বাস আছে বলিয়া গ্রামটিতে লক্ষ্মীশ্রীও আছে। একদা চৈত্রের দিবাবসানে ত্রিংশবর্ষবয়স্কা একটি রমণী এই গ্রামের অতি-ক্ষুদ্র এক পর্ণকুটীরে দ্বিপ্রহরের নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রসাধনে রত হইল। স্বভাবত এই কাজে স্ত্রীলোকেরা প্রভূত সময়াতিপাত করিয়া থাকেন, কিন্তু এই রমণী মোটেই সেরূপ করিল না। একখানি টিনেমোড়া চারি আঙুল পরিমাণ আয়না এবং সুবৃহৎ একটি চিরুনি ও খানিকটা জলের সাহায্যে প্রসাধন সারিয়া রমণী ললাটে সিন্দূর পরিল এবং তাম্বূল-রাগে ঠোঁট দুইখানি রাঙাইয়া কলসী কাঁখে গজগমনে গ্রামের পথে বাহির হইল।

কিন্তু সোজা গ্রামের বাপীতটে উপস্থিত না হইয়া রমণী দরজার বাঁশের ঝাঁপ তুলিয়া কোনও প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে চারিটি চালাঘর, মাটির পোতা এবং ঝাঁপের বেড়া। তকতকে ঝকঝকে উঠান ও ঘরগুলি গৃহকর্ত্তার সাচ্ছল্যের পরিচয় দিতেছিল। উঠানের চারি কোণে চারিটি ঘর, তিনটির দরজা উঠানমুখী, চতুর্থটির বহির্মুখী—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনখানি অন্তঃপুর এবং চতুর্থটি বৈঠকখানা। সদর-বাড়ির মণ্ডপের সামনের

উঠানে কিছু বেগুন ও শাক জন্মিয়াছিল। বাড়ির চারিদিকে নলচিতের বেড়া, দরমার ঝাঁপ, সুতরাং উক্ত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে রমণীকে বেগ পাইতে হইল না।

প্রবেশ করিয়াই সে বরাবর অন্তঃপুরে চলিল। সেখানে দুইটি প্রাণী ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, দিবানিদ্রা সারিয়া অপর পুরবাসিনীগণ সম্ভবত এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুইটি প্রাণী—একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী, অপরটি চারি বৎসরের এক শিশু। তরুণী কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে ব্যস্ত ছিল, শিশু আপনমনে খেলা করিতে-ছিল। সে অপরূপ এক খেলা, পার্শ্বস্থিত দোয়াতের সবখানি কালি একেবারে মুখে মাখিয়া তাহার আনন্দের অবধি ছিল না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালায় যাইবার সময় অনবধানতাবশতঃ দোয়াতটি সেখানে ফেলিয়া গিয়া থাকিবে, দুষ্ট শিশু দাদার ভুলের শাস্তি ভাল করিয়াই দিতেছিল।

আগন্তুকা তরুণী পাশে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করছিস লা ?

আনন্দে তরুণীর মুখে হাসি দেখা দিল, বলিল, কি ভাগ্যি, দিদির আজ এত দয়া! না জানি কার মুখ দেখে আজ উঠেছি! অভ্যাগতাও হাসিল, হাসিয়া বলিল, কার মুখ দেখে উঠবে আবার? রোজ যার মুখ দেখ, তার মুখই দেখেছ।

কিন্তু এই কথাতে যুবতীর মুখ সহসা কালো হইয়া উঠিল। অভ্যাগতা অপ্রস্তুত হইল, তাহারও মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

"অভ্যাগতা যে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে শ্যামবর্ণা—কাল নয়—কিন্তু তত শ্যামও নয়। মুখকান্তি নিতান্ত সুন্দর নয়, অথচ কোন অংশ চক্ষুর অপ্রিয়কর নয়; তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের 'হাসিহাসি'-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল। দেহময় যে অলঙ্কার সকল ছিল, তাহা সংখ্যায় বড় অধিক না হইবে, কিন্তু

একটি মুটের বোঝা বটে। যে শঙ্খবণিক সেই বিশাল শঙ্খ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বকর্ম্মার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সন্দেহ নাই। আভরণ-ময়ীর স্থূলাঙ্গে একখানি মোটা শাটী ছিল; শাটীখানি বুঝি রজকের উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেককাল গতিবিধি করে নাই।

"অষ্টাদশবর্ষীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদৃশ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে পূর্ব্ববঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠবিকৃতি সংলক্ষিত হইত না; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণচ্ছটা মনোদুঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল; তথাচ যেমন মধ্যাহ্নরবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্দ্ধপ্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল। অতিবর্দ্ধিত কেশজাল অযত্ন-শিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন-দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব উর্দ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষ স্ফুরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা প্রকটিত হইল। কিন্তু সে যৌবন-মদমত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপে চিন্তাকুলতা প্রতীত হইত; এবং তথায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দেখিলেই বুঝা যাইত, সে হৃদয়তলে কত সুখদুঃখ বিরাজ করিতেছে। তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল; তথাচ পরিধেয় পরিষ্কার শাটীখণ্ড মধ্যে যাহা অর্দ্ধদৃষ্ট হইতেছিল, তাহার অনুরূপ শিল্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র প্রকোষ্ঠে 'চুড়ী' ও বাহুতে 'মুড়কিমাতুলী', ইহাও বড় সুগঠন।"

তরুণী হাতের কাজ এক পাশে রাখিয়া অভ্যাগতার সহিত আলাপ করিতে বসিল। অভ্যাগতাও নিজের সংসারযন্ত্রণার কথা এক কাহন করিয়া বলিতে শুরু করিল; আসলে হয়তো সে সকল অনুযোগের কোনও যথার্থ ভিত্তি নাই। তথাপি বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। কর্দ্দমাক্ত অঞ্চলে নয়নাশ্রু যত মুছে, ততই তাহা উথলিয়া উঠিতে থাকে। শেষে সে প্রায় জাঁকাইয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে শিশুর কালি-মাখা মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল, আর কাঁদা হইল না, রমণী হাসিয়া ফেলিল।

এদিকে প্রায় সন্ধ্যা নামিয়া আসিল দেখিয়া আগন্তুকা ঘাটে জল আনিবার জন্য তরুণীকে আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু তরুণী রাজি হইল না। অপরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে গম্ভীর মুখে নবীনা বলিল, তুই জানিস তো কনকদিদি, আমি কখনও জল আনিতে যাই না।

কনক বলিল, সেই জন্যেই তো যেতে বলি, তুই কেন দিনরাত্তির এই খাঁচায় বন্ধ থাকবি? অন্য বাড়ির বউ ঝি সবাই তো জল আনে।

তরুণী তথাপি অটল; বলিল, ঝগড়ায় কাজ কি কনক! তুই তো জানিস স্বামী আমার ঘাটে যাওয়া পছন্দ করেন না। তাঁকেও তো তুই জানিস?

কনক উত্তর না দিয়া চারিদিকে একবার চকিতে দেখিয়া লইল, কি যেন বলিবে ইচ্ছা করিয়া কিয়ৎকাল নতমস্তকে বসিয়া রহিল। তরুণী প্রশ্ন করিল, কনক, কি ভাবছিস?

কনক বলিল, তোর চোখ থাকলে—

তরুণী ইঙ্গিতে তাহাকে অধিক অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া বলিল, চুপ, বুঝেছি। কিছুক্ষণ অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে সে বসিয়া রহিল, পরে কহিল, চল্, কিন্তু পাপ হবে না তো?

কনক হাসিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, আমি ভট্টাচায্যি বামুন নই,

পাপ-পুণ্যের খবর রাখি না। কিন্তু আমার আড়াই কুড়ি মিনসে থাকলেও আমি ভয় করতাম না।

"বড় বুকের পাটা—বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল; পঞ্চাশটা! হ্যাঁলো, এতগুলি কি তোর সাধ?

"কনক দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল, মুখে আনিতে পাপ; কিন্তু বিধাতা যে একটা দিয়েছেন, পঞ্চাশটাও যদি তেমনি হয়, তবে কোটী খানেকেই বা কি ক্ষতি? কাহারও সঙ্গে যদি দেখাসাক্ষাৎ না হইল তবে আমি কোটী পুরুষের স্ত্রী হইয়াও সতীসাধ্বী পতিব্রতা।

"কুলীনে কপাল—বলিয়া তরুণী চঞ্চল পদে পাকশালা হইতে একটি ক্ষুদ্র কলসী আনয়ন করিলেন। যেমন বারিবাহিনী তেমনই কলসী। তখন উভয়ে প্রবাহিনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, এখন এস দেখি মোর গৌরবিনী, হাঁ-করাগুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।

"মর পোড়ার বাঁদর—বলিয়া কনকের সমভিব্যাহারিণী অবগুণ্ঠনে সলজ্জবদন আচ্ছন্ন করিলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম সন্দর্শন

"অপনীত সূর্য্যকর নারিকেলাদি বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নিশা ধরাবাসিনী হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সমভিব্যাহারিণী কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। পথিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল; পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে তদ্রূপ উদ্যান বড় বিরল। সুশোভন লৌহরেলের পরিধি মধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও

মল্লিকার কলি পথিকার নেত্রমোদন করিতেছিল। পূর্ব্বতন পদ্ধতিমত চতুষ্কোণ ও অণ্ডাকার বহুতর চান্‌কার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণপথ সুরচিত ছিল। উদ্যানমধ্যে একটি পুষ্করিণী। তাহার তীর কোমল তৃণাবলিতে সুসজ্জিত; একদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী। ঘাটের সম্মুখে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল।

"বয়োধিক যে ব্যক্তি, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে; দীর্ঘ শরীর, স্থূলাকার পুরুষ। অতি স্থূলকায় বলিয়াই সুগঠন বলা যাইতে পারিল না। বর্ণ কঠোর শ্যাম; কান্তি কোনও অংশে এমত নহে যে, সে-ব্যক্তিকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে; বরং মুখে কিছু অমধুরতা ব্যক্ত ছিল। বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে; কিন্তু তাহার বিশেষত্ব কি যে, তাহাও হঠাৎ নিশ্চয় করা দুর্ঘট। কটিদেশে ঢাকাই ধুতি, লম্বা লম্বা পাকান ঢাকাই চাদরে মাথায় পাগড়ি বাঁধা। পাগড়িটির দৌরাত্ম্যে, যে দুই একগাছি চুল মাথায় ছিল, তাহাও দেখিতে পাওয়া ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গাত্রে;—সুতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময় অসীম দেহখানি বেশ দেখা যাইতেছিল,—আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার কবচখানিও উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। কিন্তু গলদেশে যে হেলেহার মন্দরপর্ব্বতে বাসুকীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিল, সে একেবারে পিরহাণের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিরহাণে সোনার বোতাম, তাহাতে চেন লাগান; প্রায় সকল আঙ্গুলেই অঙ্গুরীয়; হস্তে যমদণ্ডতুল্য পিচের লাঠি। বামনদেবের পাদপদ্মতুল্য দুইখানি পায়ে ইংরাজী জুতা।

"ইহার সমভিব্যাহারী পরম সুন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। তাঁহার সুবিমল স্নিগ্ধ বর্ণ, শারীরিক ব্যায়ামের অসদ্ভাবেই হউক, বা ঐহিক সুখসম্ভোগেই হউক, ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ অনতিমূল্যবান, একখানি ধুতি, অতি পরিপাটী একখানি চাদর, একটি

কেম্ব্রিকের পিরাণ ; আর গোরার বাটীর জুতা পায়। একটি আঙ্গুলে একটী আংটি ; কবচ নাই, হারও নাই।”

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি কহিল, মাধব, আবার কলকাতা ধরেছ ? এ একটা রোগ, বুঝলে ?

মাধব বলিল, রোগ কিসের ? মথুরদা, কলকাতার ওপর টান যদি আমার রোগ হয়, তা হ'লে তোমার রাধাগঞ্জের ওপর টানও রোগ।

মথুর। কেন ?

মাধব। নয় কেন ? রাধাগঞ্জের আমবাগানের ছায়ায় তুমি জীবন কাটিয়েছ তাই তুমি 'রাধাগঞ্জ রাধাগঞ্জ' কর—কলকাতার দুর্গন্ধের মধ্যে আমি এতকাল বাস করেছি তাই কলকাতার ওপর আমার টান। তা ছাড়া কলকাতায় আমার কাজ আছে।

মথুর। “কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেলপুড়ান ইংরাজিনবিশ ইয়ার বক্‌শিকে মদ-খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ ? তুমি কি কখনও কন্‌কিকে দেখ নাই ? না, ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আস্‌মান থেকে পড়েছে ?—তাই ত বটে ! ওর সঙ্গে ওটি কে ?” ✓

মাধব লজ্জিত হইল কিন্তু লজ্জা গোপন করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিল, কনকের কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবুও ও হাসছে।

মথুর কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইল না ; সে কনকের সঙ্গিনীর পরিচয় জানিতে চাহিল। মাধব নিজেও তখন পর্য্যন্ত জানিত না, সে কে, কারণ রমণীর মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত ছিল। সেও কিন্তু কম মুগ্ধ হয় নাই। রমণীর গতিভঙ্গী অপরূপ, দেহলাবণ্যের কিছু কিছু আভাসও পাওয়া যাইতেছিল। এই সময়ে সহসা বায়ুতাড়নায় রমণীর অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ সরিয়া যাওয়াতে

মাধব চমকিয়া উঠিল। মথুর তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, দেখছি, তুমি ওকে চেন। কে ও ?

মাধব বলিল, আমার শ্যালী।

মথুর। কে, রাজমোহনের স্ত্রী ?

মাধব বলিল, হ্যাঁ, সেই। মথুর সন্দিগ্ধভাবে বলিল, রাজমোহনের স্ত্রী ? অথচ আমি তো কখনও ওকে দেখি নি।

মাধব বলিল, কেমন ক'রে দেখবে ? উনি বাড়ির বার হন না।

মথুর। তবে আজ যে বড় বার হয়েছেন !

মাধব। কি জানি।

মথুর এ-কথা সে-কথার পর রাজমোহনের স্ত্রীর চরিত্র কেমন, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাই জানিতে চাহিল ও কিছু অশ্লীল ইঙ্গিতও করিল। মাধব ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল, ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে এত খবরে কি প্রয়োজন ?

"মথুর কহিল, বলিয়াছি ত দু'পাত ইংরাজি উল্‌টাইলে ভায়ারা সব অগ্নি-অবতার হইয়া বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না ত কাহার কথা কব ? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব ? যাক্ চুলায় যাক ; মুখখানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে। রাজমুহনে গোবর্দ্ধন এমন পদ্মের মধু খায় ?

"মাধব কহিল, বিবাহকে বলিয়া থাকে স্বরতি খেলা।"

দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামি-সম্ভাষণ

সঙ্গিনীর সহিত কনকময়ী গৃহাভিমুখে চলিল। কনকের সঙ্গিনী স্বভাবতই লজ্জাশীলা—পথে মথুর ও মাধব তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে ভাবিয়া তাহার লজ্জার আর অবধি রহিল না। সে কিছুক্ষণ নীরবে চলিয়া শেষে বলিল, কি পোড়াকপালে বাতাস দিদি, কি নাকালটাই হ'ল আজ!

কনক হাসিয়া বলিল, কেন, ভগ্নীপতি কি তোমার মুখ দেখে নি কখনও?

তরুণী। তার কথা বলছি না, আর একজন যে কে ছিল।

কনক। আরে, সে যে মথুরবাবু।

তরুণী। আমার ভগ্নীপতির জ্যেঠতুতো ভাই?

কনক। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

তরুণী। কি লজ্জা! এ কথা কাউকে বলিস না ভাই।

কনক। মরণ আর কি! আমার যেন আর গল্প করার কথা নেই!

কনক হাসিতেছিল। তরুণীর ইহাতে ক্রোধ হইল। বলিল, এমন জানলে তোমার সঙ্গে আসতাম না। কনক আরও হাসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তরুণী তাহার গৃহসন্নিধানে আসিয়া পড়িয়াছিল। দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তরুণী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কনক দেখিল, তরুণীর স্বামী রাজমোহন দরজায় দাঁড়াইয়া—তাহার দুই চোখ দিয়া যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। সে তরুণীর কানে কানে বলিল, আজ দেখছি একটা প্রলয় ঘটবে, তোর সঙ্গে যাব কি?

রাজমোহনের স্ত্রী বলিল, না না, তুমি থাকলে হিতে বিপরীত হবে। তুমি বাড়ি যাও।

কনক অন্য পথ ধরিল। তরুণী যতক্ষণ গৃহে প্রবেশ না করিল, রাজমোহন ততক্ষণ কিছুই বলিল না। তরুণী জলের কলসী রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইল। রাজমোহন তাহার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর অবধি আসিয়াছিল। বলিল, দাঁড়াও একটু। সে কলসীর সমস্ত জল উঠানে ঢালিয়া দিল। রাজমোহনের প্রাচীনা পিসী হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

"চুপ কর্ মাগী হারামজাদী—বলিয়া রাজমোহন বারিশূন্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ অন্তর্জ্বালাকর স্বরে কহিল, তবে রাজরাণী, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?

"রমণী অতি মৃদুস্বরে দার্ঢ্য সহকারে কহিল, জল আনিতে গিয়াছিলাম।

"যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল তিনি তথায় চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অস্পন্দিতকায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

"রাজমোহন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, জল আনিতে গিয়াছিলে! কারে বলে গিছলে ঠাকুরাণি?

"কাহারেও বলে যাই নাই।

"রাজমোহন আর ক্রোধ-প্রবাহ সম্বরণ করিতে পারিল না, চিৎকার স্বরে কহিল, কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না?

"অবলা পূর্ব্বমত মৃদুভাবে কহিল, করেছ।

"তবে গেলি কেন হারামজাদি?

"রমণী অতি গর্ব্বিত বচনে কহিল, আমি তোমার স্ত্রী। তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

"গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।

"অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন ; বজ্রনাদবৎ চিৎকারে কহিলেন, আমি তোকে হাজার বার বারণ করেছি কি না ? এবং ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া চিত্রপুত্তলিসম স্থিররূপিণী সাধ্বীর কোমল কর বজ্রমুষ্টে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন।

"অবলাবালা কিছু বুঝিলেন না, প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে এক পদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতর চক্ষে স্ত্রীঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্ত্রমুগ্ধ রহিল। ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত বজ্রনিনাদে কহিল, তোরে লাথিয়ে খুন করব।"

তরুণী তথাপি নীরব, কেবল তাহার চোখ দিয়া দরদরধারে জল ঝরিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজমোহন কিঞ্চিৎ নরম হইল। তাহার হাত আর চলিল না বটে, কিন্তু রসনা অবিরল কটূক্তি বর্ষণ করিয়া চলিল। তাহাতেও যখন তরুণী কোন কথা কহিল না, তখন রাজমোহন ধীরে ধীরে শান্ত হইল।

রাজমোহনকে শান্ত হইতে দেখিয়া পিসীর সাহস বাড়িল। তিনি অগ্রসর হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে অত্যন্ত সাবধানে রাজমোহনের প্রতি দুই-একটি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়িলেন না। রাজমোহনের রাগ যখন পূরাপূরি পড়িয়া আসিয়াছে বুঝিলেন, তখন তিনি একটি একটি করিয়া রাজমোহনের সমস্ত কটূক্তিরই জবাব দিলেন। রাজমোহন নিজের রাগে নিজেই গজরাইতেছিল, পিসীর বাক্যবাণের প্রতি সে বড় একটা নজর দিল না। শেষে পিসী-ভাইপো নিরস্ত হইয়া দুইজনে দুই দিকে গেলেন। পিসী বউমাকে শান্ত করিতে গেলেন, রাজমোহন কাহার মুণ্ডপাত করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি জমিদার-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস

বাংলার বহু প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশ যে নীচকুলোদ্ভব ইহা নিন্দার কথা হইলেও সত্য।

বংশীবদন ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের এক বৃদ্ধ জমিদারের খানসামা ছিল। এই জমিদারের নাম এবং বংশ এখন উভয়ই লোপ পাইয়াছে। প্রথম বিবাহ নিষ্ফল হওয়াতে জমিদারটি বুড়া বয়সে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু সন্তানের মুখ দেখিয়া বাঁচা এবং মরা কোনটাই তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। অবশ্য, সন্তান-ভাগ্যের পরেই তিনি যে বস্তুটি এই বৃদ্ধবয়সে সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য মনে করিতেন তাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল—একটি যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী তিনি পাইয়াছিলেন। এ কথা সত্য যে তাঁহার দুই জীবন-সঙ্গিনীর পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রায়ই তাঁহার পারিবারিক শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিত, কারণ অধিকবয়স্কা যিনি তিনি সর্ব্বক্ষণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন, যে আগে আসিয়াছে তাহার দাবি আগে, এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। বৃদ্ধ কিন্তু এ বিষয়ে নিসংশয় হইতে পারেন নাই। গতিক যখন খুবই খারাপ তখন এমন একজন মধ্যস্থ আসিয়া বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন যে, কাহারও কিছু প্রশ্ন করিবার রহিল না। বড়র নিঃসংশয় দাবি যথাযথ স্বীকার করিয়া তিনি তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিলেন। বৃদ্ধ এবং তাহার তরুণী ভার্য্যা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু এই ঘটনা যেন বৃদ্ধকে সতর্ক করিয়া দিয়া গেল; তিনি মনে মনে অনুভব করিলেন, তাঁহার ডাক পড়িতেও আর বেশি দিন নাই। পুত্র-মুখ দেখিবার কোনও সম্ভাবনাই আর রহিল না। বৃদ্ধের মন এই ভাবিয়া তিক্ত হইয়া গেল যে, তাঁহার এই বিশাল সম্পত্তি এমন সকল

লোকের ভোগে আসিবে যাহাদিগকে তিনি চেনেন না বলিলেই চলে। পত্নীর জীবিতকাল পর্য্যন্তও না হয় সম্পত্তি তাহার হাতছাড়া হইতে পারিবে না, কিন্তু আইন তাহাকে স্বামীর সম্পত্তি হইতে সামান্য ভরণ-পোষণের উপযোগী একটা ভাতা ছাড়া আর কিছুই লইতে দিবে না। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার যুবতী পত্নী যাহাতে সম্পত্তির পূরা মালিক হইতে পারে বৃদ্ধ সে বিষয়ে অবহিত হইলেন; যুবতী পত্নীর পরামর্শ ও যুক্তি তাঁহাকে চালিত করিতে লাগিল। এ বিষয়ে নিজের মনোহর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই যুবতীর অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল বলিয়া সে স্বামীকে দিয়া ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করিতে লাগিল। সমস্ত স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর করিবার দিকে বৃদ্ধ ঝোঁক দিলেন। জমিদারিকে যতটা পারেন নগদ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তিতে তিনি রূপান্তরিত করিতে লাগিলেন। নগদ টাকা সম্বন্ধে তাঁহার এই লোভ এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি যেদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তাঁহার উত্তরাধিকারিণী সেদিন যে বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া বসিল—স্থাবর জোতজমা তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র।

করুণাময়ী যে বুদ্ধিমতী, সে বিষয়ে আমাদিগকে সন্দেহ করিবার অবকাশ মাত্র না দিবার জন্য স্থির করিল, রূপা এবং রূপ নামক যে দুইটি পদার্থের সে অধিকারিণী সেই দুইটিরই সদ্গতি করিতে হইবে। সে নিজেকে বুঝাইল, ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্র সীতাবিরহে কাতর হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি গভীর প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছিলেন। মৃত স্বামীর প্রতি তাহার প্রভূত ভালবাসা এই প্রকারের প্রতিনিধি-পদ্ধতির সাহায্যেই বা সার্থক হইবে না কেন? সে আরও ভাবিল যে, যে প্রিয় চলিয়া গিয়াছে, যাহাকে সে হারাইয়াছে এবং যাহার বিরহে সে শোকার্ত্ত, সামান্য ধাতুমূর্ত্তিকে তাহার প্রতিনিধি না করিয়া যদি একজন রক্তে-মাংসে গড়া

মানুষকেই সেই পদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই পদ্ধতিকে আরও উন্নত করা হয়, কারণ. মানুষ-প্রাণীটাই একটা মহত্তর ব্যাপার, ধাতুদ্রব্য অপেক্ষা মানুষের সহিত নিশ্চয়ই উহার মিল বেশি এবং এই মিল শুধু বাহিরের অবয়বের মিল নহে। এরূপ তর্কের দ্বারা মনকে দৃঢ় করিয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃও বটে আবার দেবতাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও বটে, অনতিকাল মধ্যে সে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া লইল। বাবুর খানসামা বংশীবদন ঘোষের ললাটে রাজটীকা পড়িল। ধূর্ত্ত বংশীবদনও এই সুবিধা ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রভু-পত্নীর দেহ-সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া সে তাহার অস্থাবর সম্পত্তিরও মালিক হইবে না—এমন কথা ভাবিতে পারিল না। সম্পত্তির মালিক হইতে তাহাকে মোটেই বেগ পাইতে হইল না; খানসামা হইতে সদর নায়েব পদে উন্নতি দেখিতে দেখিতে হইল।

এদিকে করুণাময়ীর তখন প্রত্যহই ঘুসঘুসে জ্বর হইতেছিল—সেই জ্বর অজ্ঞাত কারণে কিংবা হয়তো বা অত্যন্ত জ্ঞাত কারণেই হঠাৎ বাড়িয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং লুব্ধ বিধবার মনের আগুন নিবিবার বহু পূর্ব্বেই অকস্মাৎ তাহাকে তাহার সংসার ও সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্বামীর দূরসম্পর্কের লোলুপ আত্মীয়েরা একে একে সম্পত্তির লোভে আসিয়া হতাশ হইয়া দেখিল, সামান্য দুই-একটি দরিদ্র গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহারা শুনিল, অস্থাবর সম্পত্তি অতি সামান্যই ছিল এবং যাহা ছিল তাহাও বিধবার স্বামীর দাস-দাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বংশীবদন বিপুল সম্পত্তি লইয়া রাধাগঞ্জে তাহার দরিদ্র পৈতৃক ভিটাতে উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া সে যে প্রভূত ধনের মালিক হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিল না, সাধারণ রকম আরামে থাকিতে গেলে যেটুকু করা দরকার, তাহার অধিক খরচ

সে করিল না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার তিন পুত্রের ভাগ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া প্রচুর পৈতৃক অর্থলাভ ঘটিল। বহুদিনের অধিকারের ফলে তখন তাহারা এই অর্থের মালিকান স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে—তাহাদিগের পিতা যে ভয়ে সংযত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল তাহারা তাহা করা আবশ্যক মনে করিল না। তাহারা জমিদারি খরিদ করিতে লাগিল, বড় বড় ইমারত নির্ম্মাণ করাইল এবং তাহাদের অর্থের অনুপাতে আড়ম্বর ও চাল বাড়াইয়া চলিল। জ্যেষ্ঠ রামকান্ত খুব হিসাব করিয়া সুপরিচালনার ফলে তাহার নিজের অংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিল এবং বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া একমাত্র পুত্র মথুরের সক্ষম হাতে সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া গেল। মথুরের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকোপে দেশের প্রাচীন রীতিনীতির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, রামকান্তের তাহা ভাল ঠেকিত না। সে বরাবরই ইংরেজী স্কুলে পুত্রের শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ, এই ইংরেজী স্কুলগুলিকে সে শুধু অনাবশ্যক মনে করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, ইহাদের দ্বারা দেশের সত্যকার ক্ষতির আশঙ্কা করিত। মথুর বাল্যকাল হইতে পিতাকে জমিদারি পরিচালনায় সাহায্য করিত এবং জাল-জুয়াচুরি প্রজা-শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে খুব পাকা হইয়া উঠিয়াছিল।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাইয়ের ভাগ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সে স্বভাবতই অলস ও অমিতব্যয়ী ছিল বলিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে নানা বৈষয়িক গোলযোগের সৃষ্টি করিল। তাহার বাড়ি ও বাগান ছিল সব চাইতে জমকালো, কিন্তু তাহার স্থাবর সম্পত্তির আয় ছিল না বলিলেই হয় এবং বৈষয়িক এমন অব্যবস্থাও আর কাহারও ছিল না। তাহার চারি পাশে একদল ফন্দীবাজ মোসাহেব জুটিয়া নানা ফিকিরে তাহার বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল। অবস্থা যখন খারাপ তখন তাহারা নিজেদের কল্পিত কোনও বিশেষ ব্যবসায়ে যোগদান করিলে কি ভাবে অবস্থা ফিরানো

যাইতে পারে, সে বিষয়ে রঙ চড়াইয়া নানা কথা বলিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। রামকানাই তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিল এবং নিজেকে সম্পূর্ণ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় বাস উঠাইয়া আনিল। বলা বাহুল্য, পরামর্শদাতারা একটু একটু করিয়া ব্যবসায়ে সে যে টাকা ফেলিয়াছিল তাহার সবটুকুই গ্রাস করিয়া তাহাকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিল যে, অনতিবিলম্বে তাহার অব্যবস্থিত ও অবহেলিত স্থাবর সম্পত্তি নিলামে চড়িল।

রামকানাইয়ের শহরে বাস করার একটি ফল হইয়াছিল ভাল—শহরের লোকদের দেখাদেখি সে তাহার পুত্রের কলিকাতায় যতটা সম্ভব ততটা শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। হিন্দু পিতার যাহা চরম কাম্য—এক অপরূপ সুন্দরী বালিকার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া সে কামনাও সে চরিতার্থ করিয়াছিল।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের এক দরিদ্র কায়স্থ বড়াই করিত যে, দেবতা তাহাকে যে মহামূল্য সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন তাহার তুলনা মেলে না—রূপে, গুণে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ও বিনয়নম্র ব্যবহারে তাহার দুই কন্যার জোড়া নাই। কিন্তু যে অদৃষ্ট-দেবতা কোমলপ্রাণ বাঙালী ঘরের অপরূপ সুন্দরী ও অতিকোমলপ্রাণা বালিকাদের সঙ্গে অতি অপদার্থদের যোগ ঘটাইয়া থাকেন, তিনিই তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সহৃদয়া ও সুন্দরী মাতঙ্গিনীকে বর্ব্বর রাজমোহনের বাহুবন্ধনে নিক্ষেপ করিলেন। বিবাহ হওয়ার পরেও মাতঙ্গিনীর পিতার বিশ্বাস ছিল যে, বর মাতঙ্গিনীর অনুপযুক্ত হয় নাই। রাজমোহন তখন পূরা জোয়ান; বয়সের বৈষম্য সত্ত্বেও তাহা মানিবার প্রয়োজন হয় নাই। রাজমোহন দেখিতে সুপুরুষ ছিল না; কিন্তু লোকে তখন কিশোর বর খুঁজিতে গেলেই সৌন্দর্য্য দেখিত—যৌবনে যে পা দিয়াছে তেমন বরের চেহারার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হইত না। পাশের গ্রামেই তাহার বাস ছিল; বিবাহ হইয়া গেলেও

কন্যা যে পিতার নিকট হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না, এই বিবাহের পক্ষে ইহাও একটি কারণ ছিল। রাজমোহনকে যাহারা জানিত তাহারা তাহার সবল দেহ ও অপরিমেয় দেহশক্তিকে হিংসা করিত ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহাকে না দেখিয়া পারিত না। সে অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম ও পরিশ্রমী ছিল এবং কোনও কিছুতেই পশ্চাদ্‌পদ হইত না বলিয়া তাহার পিতা তাহার জন্য কিছুই না রাখিয়া যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাহাকে মোটেই শিক্ষাদীক্ষা না দিতে পারিলেও সে কখনও অভাব-অনটনে কষ্ট পাইত না। মাতঙ্গিনীর পিতা রাজমোহনের এই ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিল এবং কন্যা যে কোনও দিন অভাবের তাড়না সহ্য করিবে না, এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াই এই বিবাহ ঘটাইয়াছিল। দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবতী কন্যা হেমাঙ্গিনীই বালক মাধবের বধূ হইল।

মাধবের পিতা রামকানাই মাধবের কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাধব পিতার মৃত্যুতে কপর্দ্দকহীন হইত, কিন্তু সকলের অজ্ঞাতসারে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা তাহাকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিল।

বংশীবদনের তৃতীয় পুত্র রামগোপাল জ্যেষ্ঠ রামকান্তের মত ভাগ্যবানও ছিল না এবং মধ্যম রামকানাইয়ের মত হতভাগ্যও ছিল না। সে নিঃসন্তান অবস্থায় অল্পবয়সে ইহলীলা সম্বরণ করে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবের হাতে নিজের প্রায় সমুদয় সম্পত্তি এই সর্ত্তে দিয়া যায় যে, যতদিন তাহার বিধবা পত্নী মাধবের আশ্রয়ে থাকিবে ততদিন মাধব তাহার ভরণপোষণ করিবে।

শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মাধব পড়াশুনা লইয়াই রহিল, তাহার অবর্ত্তমানে ও তাহার সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীরাই সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে লাগিল। বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে তরুণী সুন্দরী স্ত্রীসমভিব্যাহারে শহর ছাড়িয়া দেশে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

যাত্রার পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার নিকট বিদায় লইবার জন্য সে পত্নীকে পিতৃগৃহে লইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী মাতঙ্গিনীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিল—ভাগ্যচক্রে হউক অথবা যে কারণেই হউক, ঠিক এই সময়ে রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনীও পিতৃগৃহে উপস্থিত ছিল।

শ্বশুরালয়ে বেশিদিন থাকিবার ইচ্ছা মাধবের ছিল না। পিতামাতা ও ভগ্নীর নিকট হইতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় হেমাঙ্গিনী খালি কাঁদিত। তাহার মনে হইত সে দূরে—বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে এবং হয়তো কখনও বাল্যের স্নেহস্মৃতিসম্বলিত পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিবে না। তাহার পিতামাতা কি কখনও তাহাকে দেখিতে যাইবেন? বাবা বলিয়াছেন, তিনি যাইবেন। কিন্তু মা? দিদি? মা ও দিদি উত্তর দেয় নাই, নীরবে কাঁদিয়াছিল ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

মাতঙ্গিনী একদিন ভগিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে এক পাশে লইয়া গিয়া বলিল, হেম, তোকে একটা কথা বলব, রাখবি? হেমাঙ্গিনী জবাব না দিয়া ডাগর কালো চোখের বিস্মিত আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া দিদির দিকে চাহিল।

মাতঙ্গিনী আবার বলিল, হেম, কালকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে, নয়? হেমাঙ্গিনী আর থাকিতে পারিল না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাতঙ্গিনী নিজে বহুকষ্টে কান্না সামলাইয়া বলিল, কাঁদিস নে বোন, কাঁদিস নে। ভগবান তোর মঙ্গল করবেন। মাধবের মত স্বামী পেয়েছিস, সে তোকে অসুখী করবে না।—এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখে অশ্রুর বান ডাকিল; গাল ছাপাইয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হেমাঙ্গিনীর পদ্মের মত শুভ্র হাতের উপর পড়িল। হাতখানি মাতঙ্গিনীর হাতে ধরা ছিল।

চোখ মুছিয়া হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কিছু বলছিলে দিদি?

—হেম, আমি বড় গরীব—এত গরীব, তবু শুধু নিজের জন্যে হ'লে তোকে কিছু বলতাম না। কিন্তু আমার স্বামী, সে যাই হোক বোন, ভগবান তাকে অমনই গড়েছেন—তবু সে আমার সব, তার জন্যে আমাকে ভাবতে হয়; সে এখন বেকার ব'সে আছে, অবস্থা তার ভারী খারাপ। তার হয়ে মাধবের কাছে তোকে কিছু বলতে বলেছে, পারবি ?

—পারব না কেন দিদি, কিন্তু কি বলব ?

—বলবি যদি সে তার একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে—এমন কিছু যাতে সংসারটা চ'লে যায়।

—নিশ্চয়ই বলব দিদি।

হেমাঙ্গিনী প্রতিশ্রুত হইল। তারপর দুই ভগিনী অন্য বিষয় লইয়া কথা বলিতে লাগিল।

কিন্তু হেমাঙ্গিনী দিদির প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে এমন একটি কাজের ভার লইল, যাহা সে কেমন করিয়া করিয়া উঠিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহার বয়সটা এমন কাঁচা যে, এ বয়সে আমাদের দেশের মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারে না, এমন একটা বিষয় লইয়া কথা তো বলেই না। তবু সে মন স্থির করিয়া স্বামীকে তাহার দিদির সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা বলিয়া ফেলিল। মাধব সাধ্যমত চেষ্টা করিবে বলিল।

রাজমোহন গোঁয়ারদের স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ সরাসরি ভায়রা-ভাইয়ের নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা না জানাইয়া সাধারণত দরিদ্র আত্মীয়েরা যে পন্থার আশ্রয় লয়, সেই পথে শাড়ি-রাজ্যের প্রতিনিধির আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল। মাধব কিন্তু রাজমোহনকে নিজেই জবাব দিবে স্থির করিল এবং পরদিন প্রাতে রাজমোহনের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা শুরু করিল। সে যতটা সম্ভব বিনীত ভাবে রাজমোহনের বর্ত্তমান অবস্থা ও কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। রাজমোহন অন্ধ গর্ব্ব

অথবা লজ্জা অথবা অন্য কোনও মতলবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের দুরবস্থা স্বীকার না করিয়া, শুধু বলিল—বর্ত্তমানে তেমন কিছু করিতেছে না। মাধব তখন তাহাকে জানাইল যে, তাহার জমিদারির কিয়দংশের পরিচালনার ভার লইতে পারে এমন একজন বিশ্বাসী কর্ম্মঠ আত্মীয়ের সাহায্য তাহার আবশ্যক এবং রাজমোহনের যদি রাধাগঞ্জে গিয়া বাস করিবার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই আত্মীয়ের কাজটুকু করিয়া দিবার জন্য সে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে।

রাজমোহন জবাব দিল, তা হয় না ভায়া। এঁদের রেখে যাব কার কাছে?

মাধব বলিল, সে কথা কি না ভেবেই বলছি! রাধাগঞ্জেই একটা ভাল দেখে বাড়ি ঠিক ক'রে দেব।

রাজমোহন ভায়রাভাইয়ের দিকে তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিল। বলিল, রাধাগঞ্জে গিয়ে থাকবে! অসম্ভব, তার চাইতে জেলখানায় প'চে মরা ভাল।—বলিয়াই রাগে গরগর করিতে করিতে সে চলিয়া গেল।

মাধব রাজমোহনের এই অকারণ ক্রোধ দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। রাজমোহনের কিন্তু বাছিয়া লইবার মত অন্য পথ ছিল না। তাহার স্ত্রীরও অজ্ঞাত এমন একটি কারণ ছিল যে জন্য অবিলম্বে বাসস্থান পরিবর্ত্তন তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু সে রাধাগঞ্জে যাওয়ার কথা ভাবে নাই। সে দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া আবেদন করিয়াছিল বটে, কিন্তু আবেদনের মূলে দারিদ্র্যের হাত সামান্যই ছিল। মাধবের প্রস্তাবে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে—এরূপ ভাব প্রকাশ করিল। চাদর লইয়া সে বাড়ির বাহির হইয়া গেল। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে ফাঁকা মাঠের পথে সে একটানা চলিতে লাগিল—দৌড়াইতে লাগিল বলিলেই যেন ঠিক বলা হয়। কোথাও সে দাঁড়াইল না, কাহারও

সহিত সে কথা কহিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, রাজমোহন ফিরিল না।

অবশেষে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন সে গম্ভীর—মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট। সে সপরিবারে রাধাগঞ্জে যাওয়াই স্থির করিয়াছে। সে মাধবকে তাহার সঙ্কল্পের কথা নিতান্ত ভদ্রভাবে বলিল না। মাধব তাহার যাওয়ার আয়োজন করিবার সুবিধা দিবার জন্য আরও কিছুদিন থাকিয়া গেল এবং আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে সকলে মিলিয়া শহর ত্যাগ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাধাগঞ্জে পৌঁছিল।

রাজমোহনের ব্যবহার যত কর্কশই হউক, যে অভদ্রতার সঙ্গেই সে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকুক, মাধব তাহার প্রতি অতি সুন্দর ব্যবহার করিতে লাগিল। বর্ব্বর ভায়রাভাইয়ের দুর্নীতিপরায়ণ অকৃতজ্ঞ চরিত্রের কথা জানিয়াও শুধু মাতঙ্গিনীর অকারণ দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য সে মাত্র একখানি গ্রামের তত্ত্বাবধানের ভার রাজমোহনের হাতে ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু তাহার মোটা মাহিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। রাজমোহনের জন্য একটি বাড়িও নির্ম্মিত হইল, এই বাড়ির সহিতই আমরা গ্রন্থারম্ভে পাঠকের পরিচয় করাইয়াছি। মাধব রাজমোহনকে জন-মজুরের সাহায্যে চাষ করিবার উপযুক্ত জমি দিল। রাজমোহন শেষের কাজটা লইয়াই প্রায় সমস্ত সময় ব্যাপৃত থাকিত, জমিদারি শেরেস্তার কাজ সে বুঝিত না বলিলেই হয়।

কিন্তু এত করিয়াও মাধব রাজমোহনের মন জয় করিতে পারিল না। রাধাগঞ্জে পদার্পণ করা অবধি রাজমোহন হৃদয়হীন ব্যবহারে মাধবকে পীড়িত করিতে লাগিল। মাধবের সহৃদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে রাজমোহনের ব্যবহারকে শুধু হৃদয়হীন বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, রাজমোহন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিল, এবং দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক সামান্যই রহিল। মাধব বাহিরে রাজমোহনের এই অদ্ভুত আচরণ যেন

লক্ষ্যই করিল না, করিলেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি সমান দাক্ষিণ্য দেখাইতে সে কুণ্ঠিত হইল না। দুই পক্ষের এই মনোভাবের ফলে পরস্পর অত্যন্ত স্নেহসম্পন্না দুই ভগিনীর মেলামেশার অবকাশ অত্যন্ত কমিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একটি পত্র—অন্তঃপুর

মাধব জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া বাগান হইতে ফিরিয়া দেখিল, একটি লোক 'জরুরী' মার্কা এক চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে। মাধব ব্যস্তসমস্তভাবে খামখানি ছিঁড়িয়া অধীর আগ্রহে চিঠি পাড়তে লাগিল। জেলার সদর হইতে তাহার উকিল এই চিঠি পাঠাইয়াছে। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে মাধব মনে মনে যে সকল মন্তব্য করিল, সেইগুলি শুদ্ধ উহা উদ্ধৃত করিতেছি। মাধব পড়িল—

"মহার্ণব,

অধীন সদরে থাকিয়া বিশেষ যত্নসহকারে হুজুরের মামলা পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং সবগুলিতেই যে জয়লাভ ঘটিবে অধীন এইরূপ আশা পোষণ করে।"

মাধব ভাবিল—সবগুলিতেই···তুমি তা বলিতে পার উকিল, কারণ কোনটাই আমার মিথ্যা মামলা নয়। কিন্তু আদালতেই কি আর সব সময় ন্যায়বিচার হয়?···তোমার কথা কিছু বাদসাদ দিয়াই ধরিতে হইবে। লোকটা কাজের বটে, মামলা যে ভাল চালায়—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে···আর এই সব হাঙ্গামাহুজ্জুত যদি চুকিয়া যাইত! কিন্তু

প্রতিবেশীরা কি আবার মকদ্দমা বাধাইতে ছাড়িবে? হ্যা, তারপর? মাধব পড়িতে লাগিল—

"নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, অদ্য অছির সাহায্যে হুজুরের খুড়ীমাতা সদর আমীনের আদালতে হুজুরের নামে এই মর্ম্মে এক মকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর উইল জাল এবং তিনি ওয়াশীলাৎ সহ তাঁহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার দাবি করেন।"

খুড়ীমা!···বিহ্বল মাধবের হাত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। খুড়ীমা! হায় ভগবান! আমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া চান! আমি জাল করিয়াছি! হতভাগীকে লাথি মারিয়া বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিব।

মাধব কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল, শেষে নিজেকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

"তাঁহাকে এইরূপ করিবার পরামর্শ কে দিয়াছে, প্রত্যক্ষভাবে অবগত নহি; অধীন অনুসন্ধানের ত্রুটি করে নাই। কারণ, কেহ যে ইহার পিছনে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং সে একজনের নামও শুনিয়াছে। এই কার্য্যের সঙ্গে মহদাশয়েরা সব যুক্ত আছেন।"

মাধব ভাবিল, পরামর্শদাতা? কাহারা হইতে পারে? সে অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল একজন প্রতিবেশী জমিদারের কথা। তারপর আর একজনের কথা মনে হইল, কিন্তু কোনও নামটাই সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। মাধব পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু হুজুরের ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। আমি জানি উইল জাল নহে এবং যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। কিন্তু তবুও সাবধান হইতে হইবে। জজ-কোর্টের অমুক বাবুকে ও অমুক উকিলকে ওকালতনামা দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সদর আদালত হইতেও একজনকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সওয়ালজবাবের দিন এবং শেষ

শুনানীর তারিখেও সুপ্রীম কোর্টের একজন ব্যারিস্টার রাখিলে ভাল হয়। মোট কথা অধীনের যতটুকু ক্ষমতা আছে, ততটুকু প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না ; এই মকদ্দমার জন্য প্রাণ দিয়াও চেষ্টা করিব। হুজুরের অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

সেবকাধম
শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস

পুঃ—প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের জন্য আপাততঃ এক হাজার টাকা হইলেই চলিবে।"

চিঠি পড়িয়াই মাধবের প্রথম মনে হইল, সে খুড়ীমার নিকট গিয়া এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার কি বলিবার আছে তাহা জানিবে। মাধব দ্রুত ভিতর-মহলে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু সেখানে জেনানা-জীবনের অতিশয় চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ তলাইয়া গেল। গোলগাল কালো একটি ঝি, ঠিক কাহাকে লক্ষ্য করিয়া মাধব বুঝিল না, গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি দ্রব্যের অভাব লইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল। অপর একজন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিষয়ে সেও কম ভাগ্যবতী নয়, এবং ভগবানের দেওয়া বিরাট দেহখানি যতখানি সম্ভব প্রকট করিতে সে গর্ব্বই অনুভব করিতেছিল—ঝাঁটা হাতে মেঝেয় ইতস্ততবিক্ষিপ্ত স্তূপীকৃত তরিতরকারির খোসা প্রভৃতি জঙ্গল সাফ করিতে করিতে সমানে জিহ্বার ব্যবহার করিতেছিল। যে তরকারি কুটিয়াছে ঝাঁটার প্রত্যেক প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে এই অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী নারী সশব্দ অভিশাপ বর্ষণ করিতেছিল।

তৃতীয় একজন উঠানের একপাশে আঁস্তাকুড়ের ধারে বসিয়া কতকগুলি পিতলের বাসন মাজিতে ব্যস্ত ছিল ; তাহার বনেদি হাত দুইখানি যত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছিল মুখযন্ত্রও তাহার সহিত তাল রাখিয়া হতভাগ্য রাঁধুনির বিরুদ্ধে চোখাচোখা বাণ নিক্ষেপ করিতেছিল।

রাঁধুনির অপরাধ সে পিতলের পাত্রগুলিকে যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছে এবং সেইজন্যই তো এত খাটিতে হইতেছে। রন্ধনকারিণী স্বয়ং তখন এই দৃশ্য হইতে কিছু দূরে একজন বর্ষীয়সী রমণী, সম্ভবত বাড়ির কর্ত্রী অথবা গৃহিণীর, সহিত রাত্রির রান্নার ঘিয়ের পরিমাণ বিষয়ক অত্যন্ত মনোহারী প্রসঙ্গে একটু উত্তপ্ত হইয়া লিপ্ত ছিল বলিয়া বাসন-মাজা ঝি তাহার ঐহিক ও পারত্রিক জীবন সম্বন্ধে যে ভয়াবহ আলোচনা করিতেছিল তাহা শুনিতে পাইতেছিল না। অন্নব্যঞ্জন-প্রস্তুতকারিণী সাধ্বী প্রয়োজনের ঠিক দ্বিগুণ ঘি মাত্র চাহিতেছিল, কারণ নিজের ব্যবহারের জন্য খানিকটা ঘি গোপনে না সরাইলে চলিবে কেন! অন্য কোণে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা যে লোভনীয়ই হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ অতি মধুর ঘসঘস শব্দ সহযোগে বঁটিতে মাছ কোটা হইয়া পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিকা রন্ধনকারিণীর দুঃখের কারণ ঘটাইতে-ছিল। দালান ও বারান্দায় এদিকে ওদিকে মলিন মৃত্তিকা-প্রদীপ জ্বালাইয়া ছোট ছোট হাতে ধরিয়া কয়েকটি মনোহর মূর্ত্তি নিঃশব্দে না হইলেও মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া দ্রুত যাতায়াত করিতেছিল; রূপার মলের রুনুঝুনু আওয়াজ এবং কচিৎ বা ততোধিক মধুর কণ্ঠে তাহাদের পরস্পরকে আহ্বানের শব্দ কানে আসিতেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক জোড়া শিশু এই অবসরে নিজেদের বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য পরস্পরের চুল টানিয়া ছিঁড়িবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিল। এই সমস্ত আবর্জ্জনার মধ্যে তাহাদিগকে বেমানান ঠেকিতেছিল না। ছাদের এক কোণে বসিয়া একদল বালিকা সশব্দে আগডুম বাগডুম খেলায় মত্ত ছিল।

মাধব ক্ষণকাল হতাশভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—এই প্রচণ্ড কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার কথা শুনিবে কে?

শেষে যখন অসহ্য হইল, গলাটা যতদূর সম্ভব চড়াইয়া সে বলিল, আরে এই মাগীরা, তোরা থাম্ দেখি, একটা কথা বলতে দে।

এই অল্প কয়টি কথাই যেন যাদুমন্ত্রের কাজ করিল। গৃহস্থালীর অনির্দ্দিষ্ট তৈজসপত্রাদির অভাব সম্বন্ধে যাহার উচ্চ কণ্ঠ এতক্ষণ বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিতেছিল, একটা বিপুল আর্ত্তনাদের মাঝখানেই সে থামিয়া গেল—সেই গোলগাল কালো বপুখানি আর দেখা গেল না। ঝাঁটা-হস্তেন সংস্থিতা শ্রীমতীর হস্ত হইতে প্রচণ্ড অস্ত্রখানি খসিয়া পড়িল; সর্পাহতার ন্যায় মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া সে দ্রুতপদে তাহার অর্দ্ধ-উলঙ্গ মেদভার কোনও অন্ধকার কোণে লুকাইবার প্রয়াস করিল। পিত্তল বাসন মাজিবার কার্য্যে যে অনলবর্ষিণী রত ছিল, তাহার কণ্ঠের মধুর অভিশাপবাণী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; তাহার বাহু ও জিহ্বার আবর্ত্তন সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই থামিল। মৎস্যকুলের নিধন-সাধনে যে ব্যস্ত ছিল, সেও খানিক বাধা পাইল এবং যদিও সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনরায় সে কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, তেমন আওয়াজ আর তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না। রন্ধনশালায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ঘৃতবিষয়ক প্রস্তাব অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল বটে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে পলাইতে গিয়া সে ভুলক্রমে ঘিয়ের পাত্রটাই লইয়া গেল—ইহারই অংশবিশেষের জন্যই এতক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছিল। প্রদীপ হস্তে ইতস্ততসঞ্চরণশীল মূর্ত্তিরা দ্রুতধাবনে অন্তর্দ্ধান করিল বটে, তাহাদের চরণের অলঙ্কার মুখর হইয়া তাহাদিগের আত্মগোপনের পথে বাধা জন্মাইল। অন্ধকারে দুই উলঙ্গ বীরের যুদ্ধ দুই পক্ষেরই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সমাপ্ত হইল; তবে অপেক্ষাকৃত কৃতী যোদ্ধা যে, সে পলাইবার মুখেও বিপক্ষের পশ্চাতে একটি লাথি মারিয়া নিজের প্রাধান্য প্রচার করিতে ছাড়িল না। এই বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগডুম বাগডুম খেলায় রত বালিকারা খেলা ছাড়িয়া হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে পলাইল। ইতিপূর্ব্বে যে দৃশ্যের কলকোলাহলের তুলনা ছিল না, সেই দৃশ্যই হঠাৎ একেবারে নীরব হইয়া গেল, শুধু ঘরের প্রবীণা গৃহিণীই শান্ত স্থির ভাবে গৃহকর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রবীণাকে সম্বোধন করিয়া মাধব বলিল, মাসী, ব্যাপার কি ? বাড়িতে বাজার বসেছে যে !

মাসী প্রসন্ন স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, পাঁচজন মেয়ে এক জায়গায় হ'লে যা হয় তাই হচ্ছে বাছা, চ্যাচানোই তো স্বভাব ওদের।

—খুড়ীমা কোথায় মাসী ?

—সেই কথা তো আমিও ভাবছি বাপু। সকাল থেকেই তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

মাধব বিস্মিত হইয়া বলিল, সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছ না ? কথাটা তা হ'লে দেখছি সত্যি।

—কি সত্যি বাবা ?

—এমন কিছু নয় মাসী, তোমাকে পরে বলব। তা হ'লে তিনি গেলেন কোথায় ? জিজ্ঞেস ক'রে দেখ তো কেউ তাঁকে দেখেছে কি না !

মাছ ও পিতলের বাসন লইয়া যাহারা ব্যস্ত ছিল, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রবীণা কহিলেন, অম্বিকা, শ্রীমতী, তোরা কি তাকে দেখেছিস ?

মৃদু কণ্ঠে তাহারা জবাব দিল, না।

প্রবীণা কহিলেন, আশ্চর্য্য ! তারপর যেন দেওয়ালকে সম্বোধন করিয়াই কহিলেন, কেউ দেখে নি তাকে ?

দেওয়ালের ওপাশ হইতে কে জবাব দিল, স্নানের সময় তাকে বড়-বাড়িতে দেখে এসেছি।

প্রবীণা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বড়বাড়িতে ?

মাধবও বলিয়া উঠিল বড়বাড়িতে ? মথুরদাদার বাড়িতে ?—মাধব হঠাৎ যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল ; অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, মথুরদাদা ! তা হ'লে কি তিনিই এসব করাচ্ছেন ? না, না, তা হতে পারে না। আমি অন্যায় সন্দেহ করছি।

পরক্ষণেই একটু উচ্চকণ্ঠে উপস্থিত স্ত্রীলোকদের একজনকে সম্বোধন করিয়া মাধব কহিল, বড়বাড়িতে গিয়ে দেখ, সেখানে যদি খুড়ীমা থাকেন, তাঁকে এখনই আসতে বল। যদি তিনি আসতে না চান, তারও কারণ জেনে এস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুদিতচক্ষু ব্যক্তি মাত্রই নিদ্রিত নয়; প্রস্তর-প্রাচীরের মত মৃত্তিকা-প্রাচীরেরও কান থাকে।

আসুন পাঠক, আমরা মাতঙ্গিনীর নিকট ফিরিয়া যাই। স্বামী কর্তৃক কঠোরভাবে লাঞ্ছিত হইবার পর সেই যে তাহার পিসশাশুড়ী তাহাকে তাহার শয়ন-কক্ষে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত সে বাহিরে আসে নাই। দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া সে পড়িয়া ছিল। বৃদ্ধা যথাসময়ে নৈশ আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এবং ননদী কিশোরীর সকল অনুরোধ-উপরোধই ব্যর্থ হইয়াছিল, সে বাহিরে আসিয়া খাইতে বসে নাই। তাঁহারা শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুশ্চিন্তা লইয়া তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দিয়াছিলেন।

শয্যায় শুইয়া শুইয়া মাতঙ্গিনী ভাবিতেছিল, এই ভাবেই তাহাকে সারা-জীবন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সে জানিত তাহার স্বামী সে রাত্রে আর তাহার সহিত দেখা করিবে না; তাহার প্রতি কুপিত হইলে এরূপ করাই তাহার স্বভাব। ইহাতে সে কতকটা খুশিই ছিল, কারণ একা থাকিতে পাইলে সে নিজের ভাবনা চিন্তা লইয়া নিরুপদ্রবে থাকিবে।

রাত্রি গভীর হইলে বাটীর সকলে একে একে শয়ন করিতে গেল।

ঘরে ও বাহিরে গভীর শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর কক্ষে প্রদীপ ছিল না, গাঢ় অন্ধকারে কক্ষ আচ্ছন্ন ছিল, কেবল ক্ষুদ্র গবাক্ষের ফাটল দিয়া খানিকটা প্রদীপ্ত চন্দ্রকিরণ ঠাণ্ডা মাটির মেঝের উপরে আলোর একটি রেখা টানিয়া দিয়াছিল। উপাধান হইতে ঈষৎ ঊর্দ্ধে আপনার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপে বক্ষদেশ হইতে অঞ্চল-খানি কোমর অবধি টানিয়া সেই চন্দ্রকিরণরেখার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মাতঙ্গিনীর স্মৃতিপথে তাহার শৈশবের কথা উদিত হইল—যখন সে ভাবনা-বিরহিত লঘু শিশু-চিত্ত লইয়া সায়াহ্নসূর্য্যকরে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত। হায় রে শৈশব! স্নেহের হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া খোলা আকাশের তলে শুইয়া স্নিগ্ধরশ্মি-বিকিরণকারী সীমাহীন নীল আকাশ-সমুদ্রে সন্তরমান রৌপ্যগোলকের দিকে চাহিয়া কাটানো শৈশব! শিশুমনের প্রিয় কত কাহিনীই যে তাহারা পরস্পরকে শুনাইত, অথবা স্নেহময়ী ঠাকুরমার মুখে শুনিত—কি সে একাগ্রতা আর আনন্দ! এই আট বৎসরে কত পরিবর্ত্তনই যে ঘটিয়াছে! সেই উচ্চ কলকণ্ঠ কোথায় মিলাইয়াছে, যে মুখগুলিকে সে ভালবাসিত, যাহাদের স্মৃতি তাহার অন্তরে সযত্নে রক্ষিত ছিল, সেগুলি পর্য্যন্ত যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সেই স্মিত হাসি, সেই স্নেহবিজড়িত কণ্ঠস্বর—হায় রে, সেই হাসি দেখিবার জন্য ও সেই স্নেহস্বর শুনিবার জন্য আজ সে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে পারে। তাহার অন্তরের প্রেম-প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত হইতে চায়, কিন্তু পাষাণের অন্তরায়। উৎস-মুখেই সেই স্বর্গ-মন্দাকিনী-ধারা কাহার রূঢ় নিশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বেদনাময় একটি স্মৃতি—বেদনাময় তবু এত মধুর যে বারম্বার সেই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগে—তাহার অতীত সৌভাগ্যের সহিত বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের সংযোগ রক্ষা করিতেছিল। সেই স্মৃতি সে ভুলিতে চায়, কিন্তু পারে কই? ভাবিতে ভাবিতে কনকের কথা তাহার মনে পড়িল; তাহার কাছাকাছি সেই এখন একমাত্র প্রাণী,

যে তাহাকে ভালবাসে। ছলচাতুরীহীন সরল কনক ; শুধু তাহাকেই সে তাহার মনের গোপন স্মৃতির কথা নিবেদন করিয়াছে। এইটুকু ছাড়া মাতঙ্গিনীর জীবনের ইতিহাস, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের ইতিহাস মাত্র। মাতঙ্গিনী এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই কাঁদিতেছিল যে, এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই।

গ্রীষ্মের গুমট গরম ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, মাতঙ্গিনী শয্যা ছাড়িয়া জানালাটা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিল। কিন্তু জানালা খোলা হইল না—অতি মৃদু ও সতর্ক পদক্ষেপ-শব্দ সহসা তাহার কর্ণগোচর হইল। ঘরের বাহিরের শব্দ হইলেও দূরের নহে, যে জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক যেন তাহার পশ্চাতেই শব্দ হইতেছিল। মেটে ঘরের জানালা যেমন সাধারণত হয় এই জানালাটি সেই ধরনেরই ছিল—খুব ছোট, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন আর দুই ফুটের বেশি হইবে না, এবং ঘরের মেঝে হইতে ইহার উচ্চতাও দুই ফুটের অধিক নহে।

মাতঙ্গিনী থামিল, থামিয়া জানালার ফাটল দিয়া বাহিরে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অনতিদূরে একসারি গাছ এবং দূরে চন্দ্রালোকিত আকাশের পটভূমিতে অপর কতকগুলি গাছের আন্দোলিত শীর্ষদেশ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইল না।

পদশব্দ যেখান হইতে আসিতেছিল, সেখানে বা তাহার কাছাকাছিও কোনও পায়ে-চলার পথ ছিল না ; মাতঙ্গিনী ভীত হইল, পাষাণপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া আবার সেই শব্দ শুনিতে চেষ্টা করিল। পদধ্বনি তাহার অত্যন্ত নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। মাতঙ্গিনী শুনিতে পাইল, কাহারা অতি মৃদুস্বরে যেন কানে কানে কথা কহিতেছে ; কথোপকথন-নিরতদের মধ্যে একজনের কণ্ঠ তাহার স্বামীর কণ্ঠ বলিয়া চিনিতে পারাতে মাতঙ্গিনীর কৌতূহল ভয়ানক বাড়িয়া গেল ; ওই কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কথা বলিতেছিল। মাতঙ্গিনী ও ইহাদের মধ্যে

তখন একটি সামান্য মেটে দেওয়াল ছাড়া অন্য ব্যবধান ছিল না বলিয়া একেবারে স্পষ্ট সব কথা শুনিতে না পাইলেও বক্তাদের উদ্দেশ্য বুঝিবার মত সব কিছুই শুনিতে পাইতেছিল।

পরস্পর কিঞ্চিৎ বাক্যবিনিময় হওয়ার পর একজন বলিল, অত জোরে কথা বলছ কেন? তোমার বাড়ির লোকে শুনতে পাবে যে!

মাতঙ্গিনী গলার আওয়াজে বুঝিল, রাজমোহন বলিতেছে—এত রাত্রে কেউ জেগে নেই।

—আচ্ছা দেখ, দেয়ালের কাছ থেকে একটু স'রে গিয়ে কথা বললে হয় না? যদি কেউ জেগে থাকেও আমাদের কথা সে শুনতে পাবে না।—অপর ব্যক্তি এই মন্তব্য করিল।

রাজমোহন বলিল, না হে, না, তোমার কথা যদি সত্যিও হয়, কেউ যদি জেগেও থাকে; তা হ'লে আমরা এই জায়গাটাতেই সব চাইতে নিরাপদ আছি—দেয়ালের আর চালের আড়ালে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না, জানলার ফাটল দিয়েও এখানটা দেখা যায় না। এত রাত্রে যদি কেউ বাইরে আসে, তা হ'লেও আমাদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

অন্যজন উত্তর দিল, ঠিক। আচ্ছা, এ ঘরটায় কে থাকে?

রাজমোহন বলিল, সে খোঁজে তোমার কাজ কি? কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, তোমাকে বলতে বাধা নেই, এটা আমার শোবার ঘর, আমার স্ত্রী ছাড়া এ ঘরে কেউ নেই।

অন্যজন প্রশ্ন করিল, তোমার স্ত্রী তো জেগে থাকতেও পারে!

—ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়ই, তবু দেখে আসি। তুমি এখানেই দাঁড়াও।

মাতঙ্গিনী শুনিল, পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে যাইতেছে। মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহার উপর উঠিল—আঁচলের খসখস শব্দও শোনা গেল না; তারপর

অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘুমন্ত লোক যে ভাবে শয়ন করে, ঠিক সেইভাবে শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাজমোহন তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার অবধি আসিয়া মৃদুভাবে তাহাতে আঘাত করিল, কেহ দরজা খুলিল না। ধীরে ধীরে সে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহাতেও কোন ফল হইল না। রাজমোহন বুঝিল, মাতঙ্গিনী নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর রাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকাও অসম্ভব নয় ভাবিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিবে স্থির করিল। রাগের কারণ তো যথেষ্ট ঘটিয়াছে। রাজমোহন রান্নাঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ জ্বালিল এবং সেই প্রদীপ হাতে ফিরিয়া শোবার ঘরের দরজার পাশে প্রদীপ নামাইল, তারপর এক পায়ের সাহায্যে দরজার এক পাল্লা চাপিয়া ধরিয়া এক হাত দিয়া অন্য পাল্লাটি সজোরে টানিতেই দুই পাল্লার মাঝখানে খানিকটা ফাঁক হইল। রাজমোহন সেই পথে আঙুল ঢুকাইয়া পরীক্ষা করিল, কাঠের বড় হুড়কো, ছোট খিল এবং লোহার ছিটকিনি সবগুলিই বন্ধ আছে কি না! শুধু কাঠের বড় হুড়কোটিই লাগানো ছিল; রাজমোহন বুঝিল যে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ঘরে ঢুকিতে দিবার জন্যই মাতঙ্গিনী খিল সম্বন্ধে সাবধান হয় নাই—বাহির হইতে হুড়কো খুলিয়া ফেলা যায়। রাজমোহন দুইটি আঙুল ঢুকাইয়া হুড়কো উপরে তুলিয়া আঙুল সরাইয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল এবং দীপহস্তে ঘরের ভিতর ঢুকিল।

রাজমোহন দেখিল, তাহার স্ত্রীর দেহ শয্যায় এলানো, সে ঘুমাইতেছে। সে কয়েকবার এমন মৃদুস্বরে মাতঙ্গিনীর নাম ধরিয়া ডাকিল, ঘুমাইয়া থাকিলে সে যাহাতে না জাগিয়া পড়ে; অতি মধুর কণ্ঠে ডাকিল। রাগ বা অভিমানের বশে যদি সে চুপ করিয়া থাকে, মিষ্টস্বর শুনিয়া রাগ অভিমান ভুলিয়া হয়তো সে জবাব দিবে। মাতঙ্গিনী তবুও নীরব, তাহার নিঃশ্বাস ঘন হইয়া পড়িতেছে। মাতঙ্গিনীর ঘুমের ভান করিবার কোনই কারণ রাজমোহন ভাবিয়া পাইল না, সে তাহার ঘুম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরের

বাহিরে আসিয়া যে কৌশলে দরজা খুলিয়াছিল, ঠিক সেই কৌশলে আবার তাহা বন্ধ করিল। তাহার পর, প্রদীপ নিবাইয়া বাড়ির চারিদিকে একবার টহল দিতে দিতে প্রত্যেক ঘরের দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া নিদ্রিতদের নাম ধরিয়া ধীরে ধীরে ডাকিয়া কাহাকেও জাগ্রত না দেখিয়া তাহার সঙ্গীর কাছে ফিরিয়া গেল।

স্বামীর পদশব্দ মিলাইতে না মিলাইতে মাতঙ্গিনী শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার নিঃশব্দপদসঞ্চারে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা শুনিল।

কোন দিক দিয়া ভয়ের কোনও আশঙ্কা নাই জানিয়া রাজমোহনের অজ্ঞাত সঙ্গী কহিল, তুমি তা হ'লে এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ?

বিশেষ রাজি নই।—রাজমোহন জবাব দিল।—অবিশ্যি এতদূর এগিয়ে সাধুগিরি ফলাবার মতলব আমার নেই, কিন্তু লোকটাকে আমি পছন্দ না করলেও সে আমার অনেক উপকার করেছে।

ধূর্ত্ত আগন্তুক প্রশ্ন করিল, তা হ'লে তাকে তোমার ভাল লাগে না কেন?

রাজমোহন বলিল, কেন? ভাল সে আমার অনেক করেছে বটে, কিন্তু মন্দও কম করে নি, সম্ভবত ভালর চাইতে মন্দই করেছে বেশি।

—তা হ'লে আমাদের সাহায্য করছ না কেন?

—করব, কিন্তু আমি যা চাইব তা আমাকে দিতে হবে। আমি এ পাপ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র উঠে যেতে চাই, কিন্তু অন্যত্র গেলে আমার দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটা ভার হবে। সুতরাং যাতে অন্য জায়গায় উঠে গেলেও আমার বিপদ হবে না, সেই পরিমাণ টাকা আমার চাই। তোমাদের সাহায্য করলে তোমরা যদি টাকাটা পাইয়ে দাও, আমি রাজি আছি।

আগন্তুক বলিল, তোমার কত চাই, বল।

রাজমোহন জবাব দিল, আমাকে কি করতে হবে, তা জানতে পারলে আমার দাবির কথা বলতে পারি।

—ইতিপূর্ব্বে একবার যা করেছ তাই করতে হবে। তার অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু সরাতে হবে, এই কাজে তোমার সাহায্য দরকার। এবারে নগদ টাকা ছাড়া আর যা কিছু পাব সব তোমার জিম্মায় রেখে দেব; কিন্তু কাজটা আজ রাত্রেই করা চাই।

রাজমোহন বলিল, বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার সাহায্য তোমাদের কতখানি দরকার সে খবর আমার কাছে লুকুলে তোমাদের বিশেষ সুবিধা হবে না। অমন ডাকসাইটে ধনীর ঘরে অমন ব্যাপার করার ফল কি দাঁড়াবে বুঝতেই পারছ—সম্পত্তির খোঁজে কি ভয়ঙ্কর খবরদারি আর খানাতল্লাসি যে চলবে! তোমরা চাইছ এমন একজন লোক যে ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের এই অপহৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যতদিন না তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে তার উপস্বত্ব ভোগ করতে পার—এমন লোক হওয়া চাই যে একেবারেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমাকে পাকড়াও করেছ ঠিকই, কারণ তোমরা জান এ কাজ আমার মত আর কেউ করতে পারবে না, আমাকে কেউ সহজে সন্দেহ করবে না, তা ছাড়া ওসব জিনিস লুকিয়ে রাখবার মত জায়গাও আমার আছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমার দাবি তোমাদের কাছে বেশি মনে হবে।

পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, আগন্তুক একজন ডাকাত—সে বলিল, বুঝতেই যখন পারছ, একটু হিসেব করে বল।

রাজমোহন বলিল, আমি দরকষাকষি করতে চাই নে—তোমরা সম্পত্তি বিক্রি ক'রে যা পাবে, তার চার ভাগের এক ভাগ আমাকে দিতে হবে।

দস্যু রাজমোহনকে ভাল রকমই চিনিত, সে বুঝিল, রাজমোহন অবস্থা

বুঝিয়া দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, আমার কথা যদি শুনতে চাও, আমি রাজি। কিন্তু অন্যদের মতও তো নেওয়া দরকার। অবিশ্যি তুমি জান আমার কথায় তারা অমত করবে না।

রাজমোহন বলিল, তা আমি জানি, কিন্তু আমার আর একটা কথা আছে; মাল সরিয়ে ফেলবার আগে, আন্দাজে একটা দাম ধ'রে আমাকে নগদ তার একের চার ভাগ দিতে হবে। অবিশ্যি, বিক্রি করতে গিয়ে যদি দাম কম পাও, আমি টাকা ফেরত দেব, বেশি পেলে, তোমরা বাকিটা দ'রে দেবে।

বেশ বেশ, তাতে আর কথা কি, কিন্তু আমাদের আর একটা শর্ত্ত আছে—আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

—তার জন্যে আলাদা ইনাম দিলে নিশ্চয়ই করব।

—ইনাম পাবে বই কি। মাধব ঘোষের সম্পত্তি আমরা নিজেদের জন্যে চাই, অন্য একজনের আর একটা ফরমাস আছে।

কৌতূহলী রাজমোহন প্রশ্ন করিল, কি আবার?

—মাধব ঘোষের খুড়োর উইল।

রাজমোহন সামান্য বিচলিত হইল। শুধু বলিল, হুঁ।

—হ্যাঁ, দাম আমরা এর জন্যে দেব। এই উইল সে কোথায় রাখে তোমাকে বলতে হবে।

—আমি নিজেও ঠিক জানি না, তবে একটা হাতবাক্স থেকে তার জরুরী কাগজপত্র বের করতে আমি দেখেছি; কিন্তু সেটা কোথায় থাকে আমি জানি না, অন্য কোনও বাক্সে, কি সিন্দুকে কিংবা আলমারিতে হয়তো সেটা থাকে। আমি ঠিক জানি না—কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এটা কার ফরমাস বল তো?

—তা বলতে আমরা বাধ্য নই।

—আমাকেও বলবে না?

—কাউকে না।

—মথুর ঘোষ, নয় ?

—হতে পারে, না হতেও পারে। আচ্ছা, বাক্সটা কি রকমের ?

—আমাকে দিচ্ছ কি ?

—কি চাও তুমি ?

—নগদ দুশো টাকা।

—দুটো কি তিনটে কথার জন্যে দুশো টাকা ? বড্ড বেশি। কিন্তু আমাদের কাজও তো ঢের।—দস্যু যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, সমস্ত রাত ধ'রে একটা কাগজের টুকরো খোঁজা ! বাক্সটা নিশ্চয়ই শোবার ঘরের লোহার সিন্দুকে আছে ; বাক্সটা দেখতে কেমন জানতে পারলে আর বের করা কঠিন হবে না। তোমার সঙ্গে ছ্যাঁচড়ামি করা বৃথা—বেশ, তোমার কথাতেই রাজি।

রাজমোহন বলিল, বাক্সটা হাতির দাঁতের, ডালার ওপর সোনা দিয়ে লেখা তিনটি ইংরেজী অক্ষর—তার নামের প্রথম অক্ষর তিনটি।

দস্যু বলিল, সবই তো পাকাপাকি কথা হ'ল। এখন তুমি আমার সঙ্গে এস, দলের লোকের সঙ্গে কথা বলা যাক। আমরা একটা জায়গা ঠিক ক'রে দেব, তুমি সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। এস, আর দেরি করার সময় নেই, চাঁদ ডুববার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করতে হবে। গ্রীষ্মকালের রাত—বড্ড শিগগির ফুরিয়ে যায়।

এই বলিয়া দস্যু ও তাহার সহকারী ধীরে ধীরে দেওয়ালের ছায়ার আড়াল ছাড়িয়া পরস্পর কিছু ব্যবধান রাখিয়া বনের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অচিরকালমধ্যে এক অন্ধকার স্থানে আসিয়া মিলিত হইল। এদিকে মাতঙ্গিনী বিস্ময়ে ও আতঙ্কে বিমূঢ় হইয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লেখক এই অধ্যায়ে কয়েকটি অপদেবতার অবতারণা করিবার সুবিধা পাইয়াও হারাইয়াছেন এবং তাঁহার তরুণ পাঠক-পাঠিকাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনুতপ্ত হইতেছেন।

অলক্ষ্যে থাকিয়া যে ভয়াবহ কথোপকথন মাতঙ্গিনী শুনিল, তাহার প্রত্যেকটি কথা তাহার কানে প্রবেশ করিয়া আতঙ্কে তাহার বুকের রক্ত হিম করিয়া দিতে লাগিল। তবু কথাবার্ত্তা যতক্ষণ চলিল, সে তাহার কম্পিত দেহলতাকে ভাঙিয়া পড়িতে দিল না, ভয়াবহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্তটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মৃতবৎ মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল ভয় ও যন্ত্রণার আতিশয্যে মুহ্যমান হইয়া মূর্চ্ছিতের মত সে পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিতেই সে যাহা শুনিয়াছে, তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল। তাহার স্বামীর চরিত্র ও জীবনের নূতন ও ভীষণ একটা দিক অকস্মাৎ আলোক-সম্পাতে তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে এতদিন পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন স্বামীর কঠোর হৃদয় ও পশুর মত মেজাজের পরিচয়ই পাইয়াছিল, আজ দস্যুদলের সহকারী, সম্ভবত নিজে দস্যু, স্বামীর নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া কদর্য্য গ্লানিতে তাহার দেহ ও মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তাহার স্মৃতি এই ভাবিয়াই পীড়িত হইতে লাগিল যে, এই ব্যক্তিই এতকাল তাহার নিষ্কলঙ্ক বক্ষে বিহার করিয়াছে। ভবিষ্যতের কথাও তাহার মনে হইল—এখন হইতে জানিয়া শুনিয়াই এই ব্যক্তির বীভৎস আলিঙ্গনে তাহাকে ধরা দিতে হইবে, নিজেকে দূরে রাখিবার উপায় নাই। সে সম্পূর্ণ শক্তিহীন।

উপায় নাই, উপায় নাই, তাহাকে চিরকাল এই অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে হইবে।

এক-একবার এই সকল চিন্তায় তাহার বক্ষ উদ্বেলিত ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল—পরক্ষণেই যে পাপকর্ম্মে তাহার স্বামী সহায় হইতে যাইতেছে, তাহার ভীষণতা তাহার মানসচক্ষে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই দুশ্চিন্তায় সে কম্পান্বিত-কলেবর হইতে লাগিল। এই ভীষণ দুষ্কার্য্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহারই হেমাঙ্গিনী এবং তাহারই মাধব। তাহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল, শিরায় শিরায় যেন ফুটন্ত রক্ত প্রবাহিত হইল, সে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিল। তাহার অত্যন্ত প্রিয় আপনার জন, যাহারা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিদ্রাগত অথচ যাহাদের দ্বারে দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ, সম্ভবত ভীষণতর কিছু, তাহাদিগকে দণ্ডকালমধ্যে গ্রাস করিবার জন্য ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় সে নিজের অভিশপ্ত ভবিষ্যৎ ও লাঞ্ছিত নারীত্বের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল। যদি নিজের জীবন দিয়াও তাহাদিগকে বাঁচাইতে হয়, তাহাও করিতে হইবে।

নিজেদের বাড়ির সকলকে জাগাইয়া তুলিবার কথাই তাহার সর্ব্ব-প্রথমে মনে হইল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই সে বুঝিতে পারিল, তাহা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। রাজমোহন যে এরূপ করিতে পারে, তাহা সে বলিলেও কে বিশ্বাস করিবে? তাহার পিসীমা বিশ্বাস করিবে! তাহার বোন! তাহারা মনে করিবে, নিশ্চয়ই তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন বা বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে। যদি তাহারা বিশ্বাসও করে, মাধবকে বাঁচাইবার জন্য রাজমোহনের বিপদ তাহারা কখনও ডাকিয়া আনিবে না। তাও যদি তাহারা করিতে চায়, মাধবকে কি তাহারা বাঁচাইতে পারিবে? না, তাহারা আত্মীয় রাজমোহনকে এমনই ভয় করিয়া চলে যে তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারিবে না। যদি তাহারা তাহাকে বিশ্বাস না করে এবং সে যাহা বলিয়াছে তাহা রাজ-

মোহনের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কনকের কথা তাহার মনে হইল—মাধবের বাড়িতে খবর দিবার জন্য কনককে পাঠাইলে হয় না? কনকদের বাড়ি বেশি দূরে নয়, চুপি চুপি নিজের ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজমোহনকে বিপন্ন না করিয়া মাধবের বিপদের কথা তাহাকে জানাইয়া দিবার মত খবর কনককে দিয়া আসিলেই হইতে পারে। একেবারে অসম্ভব না হইলেও এই উপায় সুবিধার মনে হইল না। কনকের মাকে না জাগাইয়া কনককে সে জাগাইতে পারে না, কারণ সে জানে দুইজনে এক ঘরেই শোয়। কনক বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে, কিন্তু তাহার মা তাহা করিবে না; তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইতে হইলে আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিতে হইবে, তাহাতে স্বামীও জড়াইয়া পড়িবেন। কিন্তু ঈশ্বর ও মানুষকে সাক্ষী করিয়া একদিন যাহার নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সে কিছুতেই কিছু বলিতে পারে না। কনককে একলা ডাকিয়া লইয়া এই মধ্যরাত্রির অভিযানের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নয়। কনকের মা কন্যাকে মাঝরাত্রে একলা বাড়ির বাহিরে যাইতে দিতে না পারে—সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোক থাকিলেও ব্যাপারটাকে সে সমান খারাপ মনে করিবে। হিতে বিপরীতও ঘটিতে পারে—সে মাতঙ্গিনীদের ঘরের সকলকে জাগাইয়া তাহাদের হাতে মাতঙ্গিনীকে সঁপিয়া দিতে চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। মাতঙ্গিনী পাগল অথবা দুশ্চরিত্র হইয়াছে এরূপও ভাবিতে পারে। যদি তাহার মা অনুমতিও দেয়, তাহা হইলেও কি কনক এত রাত্রিতে এমন পথে একলা অথবা তাহারই মত একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাইতে সাহস করিবে, বিশেষ করিয়া ডাকাতেরা বাহির হইয়াছে, পথের ধারে লুকাইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

মাতঙ্গিনী হতাশ হইয়া বুঝিল যে, যাহা করিবার তাহাকে নিজেকেই

করিতে হইবে ; তাহাকেই যাইতে হইবে। ভাবিতেই, ভয়ে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা শিহরিরা উঠিল। রাস্তায় সাক্ষাৎ বিপদ যদিও অনেক, তবু সেগুলিই বড় বিপদ নয়। নিশীথ রাত্রের ভয়সঙ্কুল নির্জ্জনতায়, অরণ্যসঙ্কুল পথে একা যুবতী নারী সে,—স্বভাবতই সে সব কিছুকেই বিশ্বাস করিত—বনে বনে যে সকল অলৌকিক জীবের বিহারভূমি তাহাদের সম্বন্ধে শৈশবে অনেক গল্প সে শুনিয়াছে, তাহার কল্পনাপ্রবণ মনে সেগুলি আরও ভীষণ, আরও ভয়াবহ রূপ ধরিয়া বাসা বাঁধিয়া আছে। তাহা ছাড়া, ভীষণ একদল দস্যু নিকটেই কোথায় রহিয়াছে, যদি তাহাদের হাতে পড়ে ! ফল কি হইবে কল্পনায় ভাবিয়া লইয়া সে শিহরিয়া উঠিল। যদি এই দস্যুদলে তাহার স্বামী থাকে ! মাতঙ্গিনী আবার শিহরিল।

কিন্তু মাতঙ্গিনীর হৃদয়ে সাহস ছিল, তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতির জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল।

ভয়াবহ বিপদের কথা তাহার যতই মনে হইতে লাগিত, তাহার হৃদয়ের মহৎ প্রেম ততই যেন বৃদ্ধি পাইয়া উদ্বেল হইতে লাগিল, এই প্রেমের বেদীতে সে তাহার ভগ্ন হৃদয়ের দুঃসহ ভারস্বরূপ জীবনকেই উৎসর্গ করিতে চাহিল। কিন্তু নারী-হৃদয়ের অন্য এক অনুভূতি বাধার সৃজন করিল। নিশীথ রাত্রে একাকী মাধবের গৃহে সে যাইবে ! তাহাকে কে বিশ্বাস করিবে ? মাধব নিজে কি ভাবিবে ? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশ্চল-ভাবে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, ঘরের গুমট গরমে সে পীড়িত হইতেছিল—সাহস করিয়া সে ছোট জানালাটি খুলিয়া ফেলিল। গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং দূর চক্রবাল-সীমান্তে চাঁদ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার রশ্মি ক্ষীণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চন্দ্র অন্তর্হিত হইবে, দস্যুদের উন্মাদ চীৎকার শ্রুত হইবে। মাতঙ্গিনী ভাবিল, তখন ?

তাহাদের প্রাণরক্ষার বহু বিলম্ব ঘটিয়া যাইবে। আসন্ন বিপদের শঙ্কা তাহার মনের সকল বিচারবুদ্ধি দূর করিল, তাহার ভালবাসা দশ গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল, মাতঙ্গিনী আর দ্বিধা করিল না।

নিজেকে আপাদমস্তক একটা মোটা বিছানার চাদরে আবৃত করিয়া মাতঙ্গিনী সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহির হইয়া রাজমোহন যেমন করিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়াছিল ঠিক সেই ভাবে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত দরজা বন্ধ করিল। সীমাহীন শূন্যের তলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নীল আকাশের অনন্ত নীরবতা এবং দূরে বৃক্ষশ্রেণীর ঘন-সন্নিবিষ্ট শীর্ষদেশের নিঃশব্দতার মধ্যে তাহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, পা যেন চলিতে চাহিতেছিল না। বুকের উপর দুই হাত চাপিয়া সে আর্ত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "দেবতা, শক্তি দাও।" তারপর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সে দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদচারণা করিতে শুরু করিল। অরণ্যপথে চলিতে চলিতে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। অরণ্যের ভয়াবহ নীরবতা ও ছায়াময় অন্ধকার তাহাকে আতঙ্কিত করিল। বনস্পতি-সমূহের গ্রন্থিল কাণ্ডগুলি যেন প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া সেই কুটিল অন্ধকারে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। পত্রাচ্ছাদিত এক-একটি বৃক্ষশাখা অন্ধকার পথে মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, আর তাহার মনে হয় যেন তাহাদের অন্তরালে এক-একটি দৈত্য লুকাইয়া আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন বনস্থলীর এখানে সেখানে যেন এক-একটি প্রেত অথবা দস্যু ওত পাতিয়া আছে—তাহাদের প্রজ্জ্বলিত চক্ষু। গল্পে শোনা যে সব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও পৈশাচিক হাসি গভীর নিশীথে পথিককে আতঙ্কিত করিয়া মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেয়, সেই সব মূর্ত্তি ও হাসি যেন তাহার কল্পনায় ভিড় করিয়া আসিল। স্খলিত বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্ম্মরধ্বনি; চকিত নৈশ বিহঙ্গের অন্ধকার বৃক্ষ-শাখার অদৃশ্য স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বসিবার নিমিত্ত পক্ষবিধূনন শব্দ; পতিত বৃক্ষপত্রের উপর সরীসৃপের সামান্য গতিশব্দ। এমন কি

তাহার নিজের পদধ্বনিও তাহার হৃদয়কে ভয়চকিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি সে বুক বাঁধিয়া চলিতে লাগিল, মনে মনে সহস্র বার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে—কখনও বা অর্দ্ধোচ্চারিত মন্ত্র পড়িতে থাকে। দুই উচ্চ ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সমতল পথের উপরেই অন্ধকার নিবিড়তম ; একদিকে ঘন কাঁটাগুল্মের বেড়াঘেরা বৃহৎ আম্রবন, অন্যদিকে একটি পুকুরের উঁচু পাড়—ছোট ছোট গুল্মে নিবিড়ভাবে আচ্ছাদিত এবং ইহাদিগকে ছাইয়া তিনটি বটগাছের পত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ শাখা আন্দোলিত হইতেছে। নিম্নের ছায়াচ্ছন্ন পথ বটগাছের জন্য আরও অন্ধকার দেখাইতেছে। মাতঙ্গিনী সভয়ে চক্ষু ফিরাইল, আম্রবনের মধ্য হইতে একটা তীব্র আলোকরশ্মি আসিতেছিল এবং অশান্ত চাপাকণ্ঠের আওয়াজও যেন শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। সে যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই বুঝি শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়! এই তো সেই ডাকাতের দল। মাতঙ্গিনী চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—এক পা চলিতে পারিল না। বিপদের উপর বিপদ, পথশায়িত একটি কুকুর নিশীথ রাত্রের পথিকের পদশব্দে জাগরিত হইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার শুরু করিল। অমনই আমবাগান হইতে আগত কণ্ঠ-স্বর স্তব্ধ হইল। এইটুকু বুঝিতে পারিবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাতঙ্গিনীর তখনও ছিল যে, দস্যুরা কুকুরের ইঙ্গিত অবজ্ঞা করে নাই এবং তাহার ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। নূতন বিপদের আশঙ্কায় সে যেন শক্তি ফিরিয়া পাইল। হরিণের মত নিঃশব্দ চঞ্চল চরণে সে পুকুরের অন্ধকার পাড়ের দিকে ধাবমান হইয়া দ্রুত জলের ধারে পৌঁছিল। পায়ে-চলার পথে যাহারা তাহাকে খুঁজিবে, পুকুরের খাড়া পাড় তাহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে আড়াল করিল বটে, কিন্তু দস্যুরা যদি যে পাড়ে বটগাছগুলি ছিল সেই পাড়ে আসিয়া তাহার খোঁজ করে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কাছাকাছি ঝোপঝাড়ও ছিল না যে, সে লুকাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু মাতঙ্গিনী তখন সাহস সঞ্চয় করিয়াছে—সে কালবিলম্ব করিল না।

কুকুরটা তখনও ঘেউ ঘেউ করিতেছিল। মাতঙ্গিনী চক্ষের নিমিষে জলের ধার হইতে খানিকটা ভারী কাদা তুলিয়া লইয়া গায়ের মোটা চাদরে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। এইভাবে আসন্ন বিপদের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া রহিল, ভাবিল, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্রাদি সামলাইয়া লইতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না। পুকুরের অন্য পাড়ে পদ-শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল—চাপা কণ্ঠস্বর কানে আসিল। সে ধীরে ধীরে চাদরের পুঁটলিটি জলে ডুবাইল—জলে কোনও দ্রব্যপতনের শব্দ-মাত্র হইল না। তারপর বটগাছের ছায়া যেখানে ঘন হইয়া পড়িয়াছিল এমন একটা জায়গা বাছিয়া সে নিজেও জলে ডুব দিল। নিজের নাসিকার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া বসিয়া রহিল—কালো জলে বটগাছের কালো ছায়ায় যদি দেখিবার সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে তাহার মাথা ছাড়া আর কিছু দেখিবার উপায় রহিল না। তবুও পাছে তাহার কমলের মত মুখের গৌরবর্ণ তাহাকে বিপদে ফেলে, সে খোপা খুলিয়া ফেলিয়া আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদাম মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া দিল—খুব নিবিষ্ট দৃষ্টিও এখন আর কালো জলের সঙ্গে সেই কালো কেশের পার্থক্য ধরিতে পারিবে না।

দেখিতে দেখিতে পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর পুকুরের সেই পাড়ে আসিয়া মাঝ-পথে থামিল। মাতঙ্গিনী শুনিল, কিন্তু মাথা নাড়িল না।

একজন বলিল, তাজ্জব ব্যাপার, আমি যে ঝোপের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম রাস্তায় আপাদমস্তক চাদর মোড়া একটা মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য একজন বলিল, না হে না, তুমি গাছকে মানুষ ঠাউরে থাকবে—মানুষ হ'লে এর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল কি ক'রে? তা ছাড়া এই দারুণ গ্রীষ্মে অমন চাদরমুড়ি দিয়ে মাথা খারাপ না হ'লে তো কেউ বের হবে না।

জবাব শোনা গেল, "ঠিক বলেছ দাদা, হয়তো অপদেবতাই একটা দেখে থাকব।"

মাতঙ্গিনীও একবার চকিতের মত মুখ ফিরাইয়া দেখিল, আগন্তুকেরা সেই নিরীহ শান্তিভঙ্গকারিণীর সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী আরও কিয়ৎকাল জলের ভিতরে রহিল, যখন তাহাদের পদশব্দ দূরে সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল, সে বুঝিল তাহারা আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে। তখন সে সলিল-আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং ধীরে ধীরে শাড়ির জল নিংড়াইয়া ফেলিল, চাদরটি জলাশয়েই রহিল। পুনরায় সেই ভয়াবহ পায়ে-চলার পথ ধরিয়া চলিবার দুঃসাহস না দেখাইয়া সে জলের ধারে ধারে চলিল—যে পাড় ছাড়িয়া আসিল তাহারই পাশের পাড় ধরিয়া। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে বার বার পিছনে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এখানকার পথঘাট তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত, কারণ মধুমতীতে স্নান করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ বারণ হইলেও এই পুকুরে স্নানাদির জন্য আসার নিষেধ ছিল না। দুঃসাহসিকা সুন্দরী এই পাড় হইতে যে পাড় সে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে সেই পাড়ে যাওয়ার একটি সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিল—গভীর ঝোপের ভিতর দিয়া এই পথ। অবশেষে সে নানা আশঙ্কার কল্পনা করিতে করিতে সেই পরিত্যক্ত পাড়ে আসিয়া পৌঁছিল, যে আম্রকুঞ্জ এবং তৎসন্নিহিত যে জানোয়ারটি তাহাকে বিপন্ন করিয়াছিল, তাহা হইতে অনতিদূরে সে দাঁড়াইল। কিন্তু নূতন এক বিপদ আসিয়া যেন তাহার পথরোধ করিল। রাধাগঞ্জে আসা অবধি সে মাত্র দুইবার তাহার বোনের বাড়ি গিয়াছে এবং কোন বারেই পায়ে হাঁটিয়া যায় নাই, বদ্ধ পাল্কীতে যাতায়াত করিয়াছে। যতটুকু পথের সন্ধান সে রাখিত তাহা লোকের মুখে মুখে শুনিয়া। সুতরাং চৌমাথার কাছে আসিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। নিতান্ত বিপন্নের মত সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হঠাৎ যেন ভাগ্যবলে দীর্ঘ দেবদারুগাছের মাথা দেখিতে পাইল। সে জানিত, এই দেবদারুগাছটি মাধবের বাড়ির ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। সে তৎক্ষণাৎ সেই দিকের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অনতিবিলম্বে মাধবের

বৃহৎ প্রসাদের নিকট আসিয়া পড়িল এবং খিড়কির দুয়ার লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

শেষ বিপদ উত্তীর্ণ হইতে তখনও বাকি ছিল। সেই সময়ে বাড়ির সকলে নিদ্রিত। ভিতরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে—ইহাই হইল সমস্যা। খিড়কির পাশের ঘরে করুণা শয়ন করিত, মাতঙ্গিনী তাহা জানিত। করুণা বাড়ির দাসী।

কয়েকবার দ্বারে করাঘাত করিতেই করুণার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিরক্তিকঠোর কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, এতরাত্রে দুয়ার ঠেলে কে? মাতঙ্গিনী অধীর কণ্ঠে বলিল, করুণা, তাড়াতাড়ি দরজা খোল।

অসময়ে মধুর-নিদ্রা-ভঙ্গকারী আগন্তুকের প্রতি করুণার করুণা হইবার কথা নয়, সে কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি কে গো যে, এতরাত্রে তোমাকে দরজা খুলে দিতে হবে?

নিজের নাম বলিতে অনিচ্ছুক মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল, শিগগির এস, দেখলেই বুঝতে পারবে।

করুণা ধৈর্য্য হারাইল, চীৎকার করিয়া হাঁকিল, কে গা তুমি?

মাতঙ্গিনী জবাব দিল, আমি একজন সামান্য স্ত্রীলোক, চোর নই। দেখই না এসে!

করুণার সহজ বুদ্ধি তখন ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহার বোধ হইল, চোরের গলা এমন মিঠা হয় না। আর কথা-কাটাকাটি না করিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল।

মাতঙ্গিনীকে দেখিয়া করুণার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ঠাকরুণ, তুমি?

মাতঙ্গিনী বলিল, আমি হেমের সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

করুণার বুদ্ধি যেন আবার লোপ পাইতেছিল। সে বিস্ময়ের মাত্রা

চড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিল, এতরাত্রে তুমি এখানে? কি হয়েছে মা? তোমার কাপড় ভিজে—ব্যাপার কি?

অধীর মাতঙ্গিনী তাহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, হেমের কাছে আমাকে নিয়ে চল।

করুণা বলিল, সে ঘুমুচ্ছে। তাকে জাগাচ্ছি, কিন্তু ততক্ষণে তুমি ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল, মা।

পার তো শিগগির একটা শাড়ি দাও, কিন্তু দেরি করো না।

করুণা হাতের কাছে যে শাড়ি পাইল তাহাই তাহাকে দিল। মাতঙ্গিনী চক্ষের নিমেষে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দোতলায় হেমাঙ্গিনীর কক্ষে যাইবার জন্য করুণার অনুসরণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সতর্ক করা, না সশস্ত্র করা

মাতঙ্গিনী একটা খোলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভগিনীকে জাগাইয়া তাহার কাছে লইয়া আসিবার জন্য করুণাকে আদেশ করিল। হেমাঙ্গিনী তখনও ঘুমায় নাই, মুহূর্ত্তকাল পরে সে উপস্থিত হইল। তাহার মুখে চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট, সাগ্রহ-সম্ভাষণে অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে মাতঙ্গিনীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, তোমাদের বাড়িতে আজ ডাকাতি হবে, আমি তোমাদের সাবধান করতে এসেছি।

বিমূঢ় হেমাঙ্গিনী অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, ডাকাতি!

করুণাও 'মাগো' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী বলিল, করুণা, চুপ কর। হেম, গোল করিস না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। তোর স্বামীকে সাবধান ক'রে তৈরি হতে বল্ গিয়ে।

কিন্তু হেমাঙ্গিনীর সে কার্য্য করিবার সাধ্য ছিল না। সে ভয়ে বিবর্ণ ও কম্পান্বিতকলেবর, তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না, পা চলিতে চাহিল না। মাতঙ্গিনীও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। সে দেখিল, তাহার ভগিনী আতঙ্কে আত্মহারা হইয়াছে। এদিকে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। মুখরা করুণা অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন ভয়ঙ্কর একটা সংবাদবহনের প্রথমা দূতী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহা ছাড়া এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে তাহার আতঙ্ক এমন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, সে নিজেই মাতঙ্গিনীর দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। মৎস্যকুল-বিনাশিনী করুণা অমঙ্গলের দূতী হওয়াটা মহাগর্ব্বের ব্যাপার মনে করিয়া যে কার্য্য ন্যায়ত হেমাঙ্গিনীর করা উচিত ছিল সেই কার্য্য সাধন করিবার জন্য মাধবের শয়নকক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল।

অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া মাতঙ্গিনীকে জানাইল, মাধব তাহার কথা বিশ্বাস করিতেছে না ; বিশেষত মাতঙ্গিনী মাধবের বাড়িতে উপস্থিত এবং সে-ই এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে—করুণার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মাধব আরও অবিশ্বাসী হইয়াছে ; মাধব বলিয়াছে, সে যদি এখানে এসে থাকে, তার কাছ থেকেই খবরটা শুনতে চাই। তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়, তার মুখে শুনলেই বুঝতে পারব বিপদ কতখানি। তাকে এখানে আসতে বল্।

মাতঙ্গিনী ভগিনীকে বলিল, তুই যা হেমা, মাধবকে বল্ গিয়ে যে আমি এসেছি এবং যা বলছি তা সত্যি। তোর কথা সে বিশ্বাস করবে।

হেমাঙ্গিনী বলিল, সে আমি পারব না, তুমি নিজে যাও দিদি, তিনি যা জিজ্ঞেস করবেন, তার জবাব আমি দেব কেমন ক'রে? তুমিই সব কথার জবাব দাও গিয়ে। আর সময় নষ্ট ক'রো না। তুমি যা বলছ, তাই যদি হয় তা হ'লে—

—আমার না যাওয়াটাই ভাল হেম। তাকে বল্ গিয়ে আমি এসব কথা বলেছি আর সত্যি কথা বলেছি।

অনিচ্ছুক হেমাঙ্গিনী বালিকার মত গোঁ ধরিয়া বলিল, না দিদি, তুমিই যাও।

মাতঙ্গিনী অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিচলিতস্বরে বলিল, আমি যেতে পারি না, আমি যাব না হেম।

করুণা হাসিতে হাসিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, হায় কপাল, তা হ'লে এসব কিছু নয়। তোমার দিদি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে মা।

হেমাঙ্গিনীর মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সত্যি দিদি, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ শুধু? আমার কিন্তু বড্ড ভয় হয়েছে। এখন বল না, কেন এসেছ।

মাতঙ্গিনী কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কি চিন্তা করিল, তারপর মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া সে বলিল, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। হেম, তুই আমার সঙ্গে আয়।

দিদির সম্মুখে স্বামীসন্নিধানে যাইতে লজ্জাশীলা হেমাঙ্গিনী কিছুতেই রাজী হইল না, যদিও মুখ ফুটিয়া সে সে কথা বলিতে পারিল না।

তা হ'লে এখানে থাক্, আমি না আসা পর্য্যন্ত আমার কথা বা এই খবর ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলিস না—এই কথা বলিয়া মাতঙ্গিনী ঝড়ের মত বারান্দা পার হইয়া গেল। ইতিমধ্যেই সে লক্ষ্য করিয়াছে বৃক্ষশীর্ষের অন্তরালে চাঁদ ডুবিতে বসিয়াছে। কিন্তু মাধবের কক্ষের দ্বারে আসিয়া মাতঙ্গিনীর পা কাঁপিতে লাগিল, আমবাগানে ডাকাতদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দাঁড়াইয়াও তাহা এমন করিয়া কাঁপে নাই। শাড়ির আঁচলটা মাথার উপর খানিকটা টানিয়া দিয়া সে ধীরে যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে অগ্রসর হইল। একবার পিছাইয়া, আবার আগাইয়া, খানিক থামিয়া সে দরজা ঠেলিল, আবার থামিল এবং অবশেষে কক্ষে

প্রবেশ করিল। সুসজ্জিত কক্ষে একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছিল এবং মূল্যবান সোফার উপর হেলান দিয়া যুবক মাধব উপবিষ্ট ছিল। মাতঙ্গিনী দেয়াল ঘেঁষিয়া যুবতীসুলভ লজ্জায় নতশির হইয়া দাঁড়াইল, ভগিনীপতির দিকে সে ক্বচিৎ নেত্রপাত করিতেছিল। মাধব চমকিয়া উঠিল এবং অর্দ্ধশায়িত অবস্থা হইতে আপনাকে কিঞ্চিৎ উত্থিত করিল।

কিন্তু উভয়ের কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; একজন যে ভয়াবহ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিতে উৎসুক, অপরে সে সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্যও আগ্রহান্বিত। এই নীরবতায় উভয়েই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। পরিশেষে মাধব পরস্পরের সম্পর্কজনিত পরিহাসের সুবিধা লইয়া কহিল, তুমি ইংরেজ মেমসাহেব হ'লে ভাল হ'ত দিদি, তা হ'লে তোমাকে আসন এগিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ করতাম। —মাধবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

—তা, দিদি, তুমি বস্‌ছ না কেন ? এই—এখানে—

মাতঙ্গিনী মাধবকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া অত্যন্ত চাপা গলায় কহিল, আমি যা বলেছি শুনেছ ?

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিল, শুনেছি। সত্যি ?

সেইরূপ অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠেই মাতঙ্গিনী জবাব দিল, সত্যি।

—আজ রাত্রেই ?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই, চাঁদ ডুবলেই তারা আক্রমণ করবে, চাঁদ ডুবতেও আর আধ দণ্ডের বেশি দেরি নেই।

—তাই নাকি ? তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ ! কিন্তু দিদি, তুমি এসব খবর পেলে কি ক'রে ?

মাতঙ্গিনী এবার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, ও কথা জিজ্ঞেস ক'রো না।

মাধব বলিল, তোমার কথার কূল-কিনারা পাচ্ছি না। ভাববার পর্য্যন্ত ক্ষমতা আমার নেই।

মাতঙ্গিনী এবার মুখখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া মাধবের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্পষ্টতর কণ্ঠে বলিল, আমাকে কি তুমি ভুলে গেছ মাধব? তোমাকে আমি মিথ্যে বলতে পারি? আর এই অসময়ে তোমার বাড়িতে একা যে আমি এসেছি—

মাধব বলিল, সত্যি, আমার ভুল হয়েছিল। তুমি এখানে দাঁড়াও দিদি, আমি লোকজনকে ডাকি।

মাধব উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাতঙ্গিনী তাহার প্রতি একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল, বলিল, আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও।

মাধব বলিল, বল।

—তোমার খুড়োর উইল কোথায় আছে? সেটার বিষয়ে সাবধান থেকো। ওদের মতলব উইল চুরি করা।

মাধব বলিল, হুঁ। খুড়ীমার মকদ্দমার কথা ভাবিয়া সে হঠাৎ যেন ব্যাপারের একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইল। বলিল, সে গুড়ে বালি।

—এই ঘরে একটা হাতীর দাঁতের বাক্সে তুমি সেটা রাখ, না?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে খবর পেলে কোথায়? মাধবের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মাতঙ্গিনী জবাব দিল, আমি কেন, তারাও এ খবর জানে।

মাধব বলিল, বুঝতে পারছি, তুমি অনেক কথাই শুনেছ। মাধব উঠিল।

—কিন্তু আর একটা কথা, আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবে?

—বল। নিশ্চয়ই রাখব।

—আমি যে তোমাকে এ খবর দিয়েছি কিংবা এ বাড়িতে রাত্রে

এসেছি যেন আর কেউ না জানতে পারে। জানতে পারলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মাধব তাচ্ছিল্যভরে গলা চড়াইয়া বলিল, প্রাণ ? তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করবে কে শুনি ?

মাতঙ্গিনী বলিল, চুপ।

মাধব নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, ওঃ, আমার খেয়াল ছিল না। আর ভুল হবে না।

—করুণা আর হেমকেও ব'লে যাও তারা যেন গোল না করে।

—করুণাকে সামলানোই মুশকিল, আমি মাগীকে দাবড়ি দিয়ে চুপ করিয়ে রাখব। তুমি হেমের সঙ্গে দরজায় খিল দিয়ে থাকবে—বাড়ির আর কেউ যেন তোমায় না দেখতে পায়। আমি ফিরে এসে তোমাকে আরও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব।

এই কথা বলিয়া মাধব তাহার পত্নী এবং করুণার নিকটে গিয়া মাতঙ্গিনীর বিষয় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নীরব থাকিতে বলিয়া দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীর দিকে ধাবিত হইল ও অচিরাৎ দারোয়ানমহলে উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গিনীর বুদ্ধিকে মাধব শ্রদ্ধা করিত, সে যে প্রতারিত হয় নাই ইহা ঠিক, তাহা ছাড়া তাহাকে ঠকাইতে সে এত ক্লেশ স্বীকারই বা করিবে কি জন্য ? সুতরাং ডাকাতদলকে বাধা দিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। ধরণী-বক্ষ নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, গৃহের ছাদে বহু মনুষ্যাকৃতি জীব আকাশের পটভূমিতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহারা জমিদারের বাছা বাছা প্রজা, জমিদার-বাড়ির সন্নিকটেই বাস করে এবং যে কোনও সময়ে দেখিতে দেখিতে ইহাদের মধ্য হইতে একদল লাঠিয়াল সংগ্রহ হইতে পারে। লাঠি, সড়কি, ইট প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে ইহাদের প্রায় সকলেই সজ্জিত ছিল—আক্রমণকারীরা প্রাচীরের ধারে আসিলে অথবা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলে এগুলির প্রয়োগে

তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য তাহারা উদ্যত হইয়া রহিল। এ কথা আমরা বলি না যে, নিশীথরাত্রের এই যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই তাহাদের হস্তধৃত লাঠির মত কঠিনহৃদয় ছিল, অনেকেই যে অকালনিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের জমিদারের ঘন ঘন কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া যদি না তাহারা বুঝিতে পারিত যে পলাইয়া তাহার বিরক্তির উদ্রেক করা অপেক্ষা সেখানে দণ্ডায়মান থাকাই অধিকতর নিরাপদ, তাহা হইলে অনেকেই মহানন্দে পলায়ন করিত। অবশ্য সকলের মনেই যথেষ্ট সাহস ছিল, কারণ, বাড়ির ছাদে লোভনীয় কিছু না থাকাতে ডাকাতেরা সেখানে পৌঁছিবে না, এ কথা তাহারা জানিত; সুতরাং আশ্বস্ত হইয়া সাহসী বীরেরা সদম্ভে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁড়ে ও চৌবে বংশের পাঁচ ছয় জন তলোয়ার, ঢাল, সড়কি ও গাদাবন্দুক হাতে সদর-দরজায় পাহারা দিতে লাগিল। চার-পাঁচজন সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এদিক ওদিক টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল, প্রয়োজন বুঝিলেই তাহারা অন্যদের সতর্ক করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। বাড়ির ভিতরে যে সমস্ত বাক্স ও সিন্দুকে মূল্যবান তৈজসাদি, গহনা, নগদ টাকা, ক্ষুদ্রায়তন অথচ বহুমূল্য বাসন-কোসন ছিল, পূর্ব্বোক্ত হাতীর দাঁতের বাক্সটিসহ সেগুলি কোথায় যেন অন্তর্দ্ধান করিল। সেই সুবৃহৎ প্রাসাদের অসংখ্য কক্ষশ্রেণীর মধ্যে গুপ্ত স্থানসমূহে সেগুলি আশ্রয় লাভ করিল—এই সকল গুপ্ত স্থানের সন্ধান যাহারা জানে না, তাহাদের পক্ষে সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। বাটীস্থ অনেকেই এসবের খবর জানিত না।

সাধারণত মাধব মৃদুস্বভাব ও নমনীয়, কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তাহার শক্তি ও কার্য্যতৎপরতা এমন প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিত যে, ভীরু ও অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন স্ত্রীলোকের অভাব হইল না, যাহারা এক হাতে উলঙ্গ শিশুদের টানিতে টানিতে অন্য হাতে বড় বড় বোঁচকা সামলাইতে সামলাইতে সেই বিপন্ন গৃহ ত্যাগ করিয়া

গোপনে প্রতিবেশীদের কুটীরে আশ্রয় লইতে ছুটিল না—তাহারা ভাবিল, সেই অনাড়ম্বর কুটীরগুলিতে দস্যুরা হস্তক্ষেপ করিবে না, সুতরাং তাহাদের সম্পত্তিগুলি রক্ষা পাইবে। গত সন্ধ্যায় যে বিবেকসম্পন্না পাচিকা কর্ত্রীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, দেখা গেল বোঁচকাবুঁচকী সমেত সেইই সর্ব্বাপেক্ষা কৌশলে দ্রুত ধাবিত হইল। গত সন্ধ্যার যুদ্ধজয়ের বিজয়মাল্য-স্বরূপ ঘিয়ের পাত্রটি সে সঙ্গে লইতে ভুলিল না।

উদ্যোগ-পর্ব্বের কলকোলাহল প্রশমিত হইল, আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া অধীর লোকজন নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। মাতঙ্গিনীর কথার সত্যতা সম্বন্ধে মাধবের সন্দেহ হইতে লাগিল। এই সন্দেহ মাধবের মনের মধ্যে ভাল করিয়া রূপ ধরিতে না ধরিতেই একজন দারোয়ান তাহার কাছে আসিয়া হিন্দীতে বলিল, যাহারা পাহারা দিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পুরানো বাগানের দিকে একটা আলোক দেখিয়াছে। মাতঙ্গিনী যে আমবাগানে দস্যুদের হাতে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছে সেইটিকেই পুরানো বাগান বলা হইত। সে আরও বলিল যে, সে ব্যক্তি সাহস করিয়া বাগানের কাছাকাছি গিয়া দেখিয়াছে কয়েকজন সশস্ত্র লোক সেখানে সম্মিলিত হইয়াছে।

সংবাদবাহক জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর হুকুম দিন, আমরা আগে ওদের উপর লাঠি চালাই।

মাধব বলিল, না ভূপসিং, তার দরকার নেই; তোমরা কম লোক গেলে ওদের কাছে কাবু হয়ে পড়বে, বেশি লোক গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে? হয়তো ওদের আর একটা দল কোথাও আছে।

দারোয়ান বলিল, মহারাজের যা হুকুম। তা হ'লে আমরা যেমন আছি, তেমনি থাকি?

—হাঁ, আর এক কাজ কর, তোমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে হাঁক দাও, ওদের সমঝিয়ে দাও আমরা তৈরি আছি।

মাধব এই কথা বলিতে না বলিতে একটানা প্রচণ্ড হুঙ্কারে নিশীথ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হইল। স্ত্রীলোকেরা কক্ষাভ্যন্তরে কম্পান্বিতকলেবরে আতঙ্কিত বিস্ময়ে সেই হুঙ্কার শুনিয়া ভাবিল, বিপদ আসন্ন। পরক্ষণেই চারিদিক স্তব্ধতায় থমথম করিতে লাগিল।

মাধব বলিল, আর একবার, আর একবার।

আবার সেই হুঙ্কারে নিশীথিনী যেন কাঁপিতে লাগিল। ইহার প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে নির্জ্জন বনভূমি হইতে এক হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল, যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকারে পিশাচদের উল্লাসধ্বনি। সেই আর্ত্তনাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতাদের শোণিতপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিল।

মাধব চীৎকার করিয়া বলিল, আবার, আবার, আরও জোরে হাঁক দাও। তাহার ভয় হইতেছিল পাছে দস্যুদলের চীৎকারে তাহার লোকজন আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। অনুচরেরা সোল্লাসে এবং সোৎসাহে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে না করিতে পুরানো বাগান হইতে জবাব আসিল। কিন্তু এবার তীব্র আর্ত্তনাদ নয়, পলায়নপর দস্যুদলের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি।

তারস্বরে অনেকে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরা পালাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে—হঠে যাবার শব্দ ওটা।

মাধব বলিল, হবে, কিন্তু তোমরা তা ব'লে নিশ্চিন্ত থেকো না—এখনও খাড়া থাক। মাধব অনুচরদের সহিত বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু আর কিছু ঘটিল না। মাধব আর একবার তাহার পাইক-বরকান্দাজদের পাহারা কড়া রাখিতে ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হুকুম দিয়া যে দুঃসাহসিনী রমণী তাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মিলনে বিরহের সূচনা

মাধব তাহার পত্নী ও শ্যালিকার সহিত মিলিত হইয়াই মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তা কি আমি ভুলতে পারি ?

হেমাঙ্গিনীর বুক হইতে আশঙ্কার গুরুভার তখন নামিয়া গিয়াছে, সে দিদিকে মাধবের নিকট একা রাখিয়া লঘুপদক্ষেপে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। মাধব আবার বলিল, তুমি যা করেছ, তা ভোলবার নয়। কথা দিয়া সে যাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না, তাহার দৃষ্টিতে সেই কৃতজ্ঞতা ছিল।

—বেশ, ভুলতে যদি না পার, হেমের জন্যে মনে ক'রে রেখ। ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও তার ওপর তোমার রাগ হয়, তার দিদির আজকের এই যন্ত্রণা-ভোগের কথা মনে ক'রে তাকে ক্ষমা ক'রো। আমার কথা যদি বল, এ আমাকে করতেই হত। যাক, আমি তা হ'লে আসি।

মাধব বলিল, সে কি দিদি, কতদিন হেম তোমাকে দেখে নি, আরও ঘণ্টা কয়েক সে তোমার সঙ্গে থাকতে পেলে খুসি হবে। যদি দু-একদিন না থাকতে চাও, সকাল হ'লেই আমার পাল্কীতে বাড়ি যেও এখন। এই রাত্রেই হেঁটে বাড়ি যাবার দরকার কি ?

মাতঙ্গিনী বিষণ্ন ভাবে বলিল, অদৃষ্টের লিখন ! সে সুখ আমার কপালে নেই ভাই। আমাকে যেতেই হবে।

মাধব আবার প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি দিদি ? আমার জানতে কিছু বাধা আছে ?

লজ্জা ও দুঃখে বিচলিত হইয়া মাতঙ্গিনী শুধু বলিল, উনি—তুমি তো ওঁকে জান! আমি এখানে থাকলে চটবেন।

—বোনের বাড়িতে থাকলে চটবেন! কেন, তুমি কি শপথ ক'রে এসেছ যে ধূলোপায়েই ফিরবে? তিনি জানেন, তুমি কোথায় আছ?

মাতঙ্গিনী বলিল, না, আমি শপথও করি নি, কোথায় আছি তা তিনি জানেনও না।

মাধব বলিল, আশ্চর্য্য, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি এলে কি ক'রে! তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরোও, উনি কোথায় ছিলেন?

হেমাঙ্গিনী বলিল, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না।

এই উত্তর শুনিয়া মাধবের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য—সে মন হইতে সকল সন্দেহ মুছিয়া ফেলিল এবং চুপ করিয়া কিছুকাল ভাবিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর আয়ত নীল বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি মাধবের দিকে নিবদ্ধ রহিল।

শেষে সে বলিয়া উঠিল, না, আর থেকে লাভ কি? আমি যাই। করুণা আমার সঙ্গে চলুক। মাতঙ্গিনী বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বর ভারী শুনাইল। সে বলিল, তবে আসি ভাই, আসি মাধব, তুমি সুখী হও।

মাধব তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু অশ্রুসজল। মাতঙ্গিনী কাঁদিতেছিল—আর আমার হেম তোমার কাছে থেকে সুখী হোক।

মাধব বলিল, তুমি কাঁদছ, কি হয়েছে দিদি?

মাতঙ্গিনী জবাব দিল না, কাঁদিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ যেন তাহার অন্তরের যন্ত্রণায় পাগল হইয়া সে মাধবের হাত দুইটি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল, তাহার পদ্মফুলের মত মুখখানি নত হইয়া হাতের কাছে আসিল। মাতঙ্গিনীর নিষ্কলঙ্ক ললাটের কোমল কুঞ্চিত কেশদামের স্পর্শের উন্মাদনায় মাধব কাঁপিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনীর অশ্রুধারায় মাধবের হাত দুই খানি সিক্ত হইয়া গেল।

—আমাকে ঘৃণা ক'রো না, আমাকে ঘৃণা ক'রো না। আবেগাতিশয্যে মাতঙ্গিনীর কুসুমসুকুমার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল—আমার এই চরম দুর্ব্বলতার জন্য ঘৃণায় মুখ ফিরিও না। মাধব, হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, তাই এই শেষ মুহূর্ত্তে বলছি, তোমাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম, তোমাকে আমি এখনও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাই তোমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিতে এত কষ্ট হচ্ছে।

মাধব কি মাতঙ্গিনীর এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল ? না, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল, চোখের জলে হাতের তালু ভিজিয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য দুই জনেই নীরব, উভয়ের বুকের স্পন্দন দ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী যেরূপ আচম্বিতে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, নিজেকে সামলাইয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইল না, সেই বুকভাঙা নীরবতা সেই প্রথমে ভঙ্গ করিল।

সেই দূরে সরিয়া থাকা, সেই সঙ্কোচ, মনের সেই বিষাদ, ভাঙা বুকের সেই হাহাকার যাহা প্রথম হইতেই মাতঙ্গিনীকে পাইয়া বসিয়াছিল, কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়াছে, গভীর উত্তপ্ত ভালবাসার হঠাৎ প্রকাশের উত্তেজনা ও অধীরতাও প্রশমিত হইয়াছে, মাতঙ্গিনী শান্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, শুধু তাহার স্বভাবত-ম্লান মুখখানি এক অব্যক্ত ভাবাবেগে উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

তাহার কোমল অঙ্গ ব্যাপিয়া একটা মধুর অথচ শান্ত গাম্ভীর্য্য তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এ গাম্ভীর্য্য নিবিড়তম আনন্দানুভূতি হইতে নয়, কারণ হৃদয়াবেগের প্রচণ্ড বন্যা তাহাকে এমন এক স্থানে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, যেখানে বর্ত্তমান অকথিত সুখের উন্মাদনায় ন্যায়-অন্যায়-বোধমাত্র থাকে না, নিকটতম বর্ত্তমান ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। মাতঙ্গিনী কেবলমাত্র মাধবের সান্নিধ্যটুকুই উপভোগ করিতেছিল, মাধবের

হাতে যে তাহার বহুদিননিরুদ্ধ অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মাধবও তো তাহার সঙ্গে চোখের জল ফেলিয়াছে! এই অনুভূতিগুলিই মাতঙ্গিনীর মনকে ভরিয়া রাখিয়াছিল—এই মুহূর্ত্ত-কালের জন্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি—যে কলঙ্কিত আনন্দ-তরঙ্গে তাহার হৃদয় ভাসমান ছিল, তাহার উজ্জ্বলতার উপরে কালো ছায়া ফেলিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে একটা জ্বালা ছিল, তাহার চাঁদের মত ললাটে একটা জ্যোতি ছিল; সে যখন তাহার নিটোল সুগোল বাহুলতা ডামাস্কবস্ত্রাচ্ছাদিত সোফার উপর রাখিয়া ঈষৎ নমিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সুগঠিত মাথাখানি করতলের উপর ন্যস্ত ছিল এবং সেই হাতের ও উদ্বেল বুকের উপর তাহার সুকৃষ্ণ বিপুল কেশদাম ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল, তখন মাধবের হঠাৎ মনে হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা নারী-সৌন্দর্য্যের চোখ-ধাঁধানো মূর্ত্তি যেন পৃথিবীতে দেখা সম্ভব নয়।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, ভেবেছিলাম মানুষের কানে কখনও আমার এই কথা পৌছবে না। তোমার কানেও নয়, কিন্তু কই, চেপে তো রাখতে পারলাম না! আমার মনে কি হচ্ছে, আমি নিজেই জানি না।

মাতঙ্গিনীর উদ্দাম প্রেম-নিবেদনের পর মাধব এই প্রথম কথা কহিল, বলিল, মাতঙ্গিনী, আমি ভেবেছিলাম সহজেই এই বিদায়ের পালা শেষ হবে, কিন্তু তুমি—এ কি করলে তুমি?

মাধবের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে বলিল, আমি বুঝতে পারছি, তুমি অনেক সহ্য করেছ, অনেক কিছু ত্যাগ করেছ। আর একবার শেষ চেষ্টা কর, তোমার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় থেকে এ চিন্তা মুছে ফেল, সব ভুলে যাও।

মাতঙ্গিনী বলিল, না, না, কিছু ব'লো না তুমি।—বলিতে বলিতে মাতঙ্গিনী যেন নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিল,

মস্তক অবনত করিয়া সে নিজের উদ্গত অশ্রুর বন্যা লুকাইতে লুকাইতে বলিয়া উঠিল, মাধব, তুমি আমাকে গালাগালি দাও, ধিক্কার দাও, আমার শিক্ষা হোক। আমি পাপী, পাপ করেছি, আমার ঈশ্বরের কাছে আমি অপরাধী এবং এই পৃথিবীতে যে আমার ঈশ্বর—আমাকে বলতে দাও মাধব, সেই তোমার কাছেও অপরাধ করেছি। আমি নিজেকে নিজে যতটা ঘৃণা করছি, তার চাইতে বেশি ঘৃণা তুমি আমাকে করতে পারবে না। ঈশ্বর জানেন, এই কবছর আমি কত সহ্য করেছি। বুক চিরে যদি দেখাতে পারতাম, দেখতে আমার বুকে কি হচ্ছে।

মাধব কাঁদিল। কাঁদিয়া বলিল, মাতঙ্গিনী—প্রিয়—। মাধব আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

—বল বল মাধব, আবার বল, যে কথা শুনবার জন্যে আমার হৃদয় এতকাল প্রতীক্ষা ক'রে আছে, আর একবার সেই কথা বল। তুমি কি তবে আমাকে এখনও ভালবাস? একটি বার মাত্র এ কথা বল, শুনে আজ রাত্রেই আমি হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করব।

মাধব নিজেকে সংযত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, মাতঙ্গিনী শোন, আমাকে ক্ষমা কর। এ দারুণ দুঃখ আর সইতে পারি না। তোমাদের বাড়িতেই আমার মনে এই আগুন ধরেছিল—বোধ হয় দুজনকেই এতে পুড়ে মরতে হবে। তখন আমরা ছোট ছিলাম, চেষ্টা করলেও এ আগুন নিবত না—সেই সময়েই যখন আমরা কর্ত্তব্যের পথ থেকে একচুল বাইরে যাই নি, আজ বহুদিন ধ'রে ঘা খেয়ে খেয়ে হৃদয় কঠিন হয়েছে, এখনই কি আমরা ভুল করব? মন থেকে এই পাপ দূর ক'রে দাও মাতঙ্গিনী, এস আমরা পরস্পরকে ভুলে যাই, দূরে দূরে থাকি।

মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মাতঙ্গিনী সোজা হইয়া দাঁড়াইল—তাহার সমস্ত দেহ এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিজের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিতে করিতে সে

বলিল, তাই হোক, মানুষের মন যদি চেষ্টা ক'রে ভুলতে পারে, তা হ'লে আমিও ভুলব। তোমাকে আমি ভুলে যাব। এস, আমরা চিরকালের জন্য বিদায় নি।

মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বরে একটা ভয়াবহ শান্তির ভাব প্রকাশ পাইল।

প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সে চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না— মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া মাধবের কাছে তাহা লুকাইতে চাহিল এবং পরক্ষণেই দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রভাত হইতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব ছিল, বিষাদিত অন্তঃকরণে ও শ্লথ পদক্ষেপে মাতঙ্গিনী আবার সেই বনপথ ধরিয়া ফিরিয়া চলিল, করুণা নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। নক্ষত্রখচিত ম্লান নীলাকাশ ততক্ষণে সঞ্চরমান লঘু মেঘখণ্ডে অর্দ্ধেক আবৃত হইয়াছে,—ঘন কৃষ্ণ একটা মেঘ দূর দিক্‌চক্রবালের প্রান্তে ভাসিতেছিল, তাহারই ধূসর ছায়া প্রতিফলিত হওয়াতে দূরে দূরে ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত বৃক্ষচূড়াগুলি গম্ভীরদর্শন মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ অরণ্যের উপর দিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল বাতাস মাঝে মাঝে একটানা একটা অশুভ আর্ত্ত বিলাপধ্বনি সৃষ্টি করিতেছিল; কচিৎ বা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ধরাবক্ষে অথবা ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপত্রের উপর পতিত হইয়া একটা সুরের সৃষ্টি করিতেছিল। মাতঙ্গিনী নিজের ভাবনায় এমনই ডুবিয়াছিল যে, বহিঃপ্রকৃতির এই রূপ দেখিবার অবকাশ তাহার ছিল না; সে শুধু ইহাই অনুভব করিয়া লইয়াছিল যে তাহার চারিদিকের প্রকৃতি যেন দুঃখভারাক্রান্ত। নিষিদ্ধ অথচ আকাঙ্ক্ষিত

মিলনের স্মৃতিটুকু তাহার মনকে ভরিয়া রাখিয়াছিল—বাড়িতে গেলে তাহারা কি ভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, তাহার স্বামী এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলেই বা তাহার কতখানি বিপদ ঘটিতে পারে—এই সকল দুশ্চিন্তা সেই মিলন-দৃশ্যের স্পষ্টতাকে বিন্দুমাত্র ছায়াচ্ছন্ন করিতে পারে নাই ; সেই স্মৃতিই তাহার মানস-চক্ষে কখনও উজ্জ্বল রঙে কখনও গভীর কালিমায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে মাধবকে কথা দিয়াছে, সে ভুলিয়া যাইবে ; কিন্তু মাধবের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে সে এই স্মৃতিরই পূজা করিতে লাগিল—মাধব যতগুলি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি সে মনে করিয়া করিয়া তাহা লইয়াই স্বপ্নরচনা করিতে লাগিল, মাধবের প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুর স্মৃতি তাহাকে পাগল করিতে লাগিল। এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার এই মনের উন্মাদনা কাটিয়া গিয়া নিজের অন্তরের পাপের স্মৃতি, সে যে দেবতাদের ও মানুষের ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা ভাবিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে আকাশ ক্রমেই কালো মূর্ত্তি ধরিতেছে দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, একটা ঝড় আসন্ন। সেই সুদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া করুণা বলিয়া উঠিল, ঠাকুরুণ, তাড়াতাড়ি চল, এখুনি ঝড় উঠবে, তার আগে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

অন্যমনস্ক মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, হ্যাঁ, তাই চল।

করুণার গতি দ্রুততর হইল, মাতঙ্গিনীও কোনও প্রয়োজনের বোধে নয়, শুধু তাহার দেখাদেখি দ্রুত চলিতে লাগিল।

করুণা বলিল, ওই দেখ গাছের পাতায় বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু হয়েছে—

তাই নাকি ?—মাতঙ্গিনী এই প্রথম তাহার স্বপ্নলোক হইতে জাগরিত হইয়া কথা বলিল। পরক্ষণেই কান পাতিয়া শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, না না, এ তো জলের ফোঁটার শব্দ নয়, তবে কি ? মনে

হচ্ছে যেন মানুষের পায়ের শব্দ, কারা যেন গাছের পাতা মাড়িয়ে চলেছে—

করুণা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, তাই নাকি ঠাকরুণ? সে তাহার গতি দ্রুত বাড়াইয়া দিল, দেরি হইলে সে অরণ্যে ইতস্ততবিচরণশীল ডাকাতদের হাতে পড়িতে পারে ভাবিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাদিগকে বেশিদূর চলিতে হইল না—ক্রোধোন্মত্ত বাতাস জাগিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, বজ্রগর্জ্জনে আকাশ মুখর হইল, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া সন্দেহের অবকাশ দিল না।

করুণা বলিল, বৃষ্টিতে ভিজে আজ মরণ হবে দেখছি। গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাথাটা বাঁচিয়ে নিলে হ'ত না?

মাতঙ্গিনী বলিল, আচ্ছা, তাই চল। বহুবিস্তৃত একটা তেঁতুলগাছের পত্র-শাখার নীচে আশ্রয় লইবার জন্য মাতঙ্গিনী অগ্রসর হইল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে তাহারা দেখিতে পাইল, তাহাদের অনতিদূরে সেই গাছেরই তলায় একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে।

করুণা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল, পালাও পালাও, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণপণে বিমূঢ় মাতঙ্গিনীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে শুরু করিল। ঝড়জলের মধ্য দিয়া ছুটিতে ছুটিতে সে বার বার চীৎকার করিতে লাগিল, পালাও পালাও। এবং যতক্ষণে না বাড়ির দরজায় পৌঁছিল ততক্ষণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ি বেশি দূরে ছিল না—তাহারা বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল।

বাড়ি পৌঁছিলে মাতঙ্গিনী বলিল, তুমি ফিরে যাও করুণা। এত রাত্রে তোমাকে ফিরে যেতে বলাটা অন্যায় হচ্ছে বুঝি, কিন্তু তুমি থাকলে বিপদের ভয় আরও বেশি। তার চাইতে এক কাজ কর, কনকদের বাড়ি যাও, তাদের বারান্দায় গিয়ে শুয়ে থাক, ঝড়টা একটু থামলে, একটু ফরসা হ'লেই ওদের বাড়ির কেউ জাগবার আগেই তুমি চলে যেও।

এই কথা বলিয়া মাতঙ্গিনী তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল, করুণা চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী দেখিল, দরজা তখনও অর্গলবদ্ধ। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে রাজমোহন যে কৌশলে দ্বারটি অর্গলমুক্ত করিয়াছিল, সেই কৌশল প্রয়োগ করিয়া দ্বার খুলিয়া মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিল। সে পুনরায় দরজা বন্ধ করিতে যাইবে, দেখিল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি মূর্ত্তি ঘরে ঢুকিয়া ভারী হুড়কাটি লাগাইয়া দিল। পা ফেলার ধরনে ও শব্দে মাতঙ্গিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, আগন্তুক তাহারই ভয়ঙ্কর পতিদেবতা।

রাজমোহন কোনও কথা কহিল না, নিঃশব্দে অন্ধকারে হাতড়াইয়া চক্‌মকি আর সোলা বাহির করিয়া আলো জ্বালিয়া যথাস্থানে সেটিকে রাখিল। তখনও সে নির্ব্বাক, তক্তপোশের এক ধারে বসিয়া সে হিংস্র দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীকে দেখিতে লাগিল। সেই দৃষ্টি দেখিয়া মাতঙ্গিনী বুঝিল তাহার ভাগ্যে কি আছে। সে বিবর্ণ বা ভয়কম্পিত না হইয়া সগর্ব্বে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার সমস্ত দেহে তেমনই প্রখর শ্রী ও সাহস ফুটিয়া উঠিল, যাহা দেখিয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় তাহায় বর্ব্বর স্বামীর ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়াছিল। বাহিরের ঝড়ের আর্ত্তনাদ, বারিপতনশব্দ ও ঊর্দ্ধাকাশের ক্রুদ্ধ মেঘের গর্জ্জন ক্ষণে ক্ষণে গৃহাভ্যন্তরের ভয়াবহ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

পরিশেষে রাজমোহন কথা কহিল, হতভাগী—! তাহার কণ্ঠস্বর তীব্র হইলেও সচরাচর রুক্ষ মেজাজের দরুন তাহার কথায় যে রূঢ় কর্কশতা থাকে এখন তাহা মোটেই ছিল না। সে বলিল, হতভাগী, উপপতি করতে গিয়েছিলি?

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর, রাজমোহন মেঝেতে পদাঘাত করিয়া চাপা অথচ ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলিল, বল্‌ বলছি।

অর্দ্ধদোষী ও অর্দ্ধনির্দ্দোষী মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, এসব কথার আমি কোনও জবাব দেব না।

জবাব দিবি না হারামজাদী ?—রাজমোহন হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে এই কথা বলিয়াই সে হঠাৎ আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, তুই আজ রাত্রে মাধব ঘোষের বাড়ি গিয়েছিলি কি না ?

মাধবের নাম শুনিবামাত্র মাতঙ্গিনীর ভাবান্তর হইল, সে সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, তোমরা তার বাড়িতে ডাকাতি করবে মতলব করেছিলে, আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

রাজমোহন দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। বজ্রকণ্ঠে হাঁকিল, দেখ মাগী, আমাকে ঠকাতে পারবি না তুই। তুই জানিস না তোকে আমি কি ভাবে পাহারা দি। যেদিন থেকে তোর রূপ হয়েছে তোর অভিশাপ, সেইদিন থেকে তোকে আমি চোখে চোখে রেখেছি। তুই ভাবিস না, তুই কি করিস না করিস আমি দেখি না।

হঠাৎ কিছু শান্ত হইয়া সে বলিতে লাগিল, হতে পারি আমি পশু, তবু আমার রূপবতী স্ত্রীর জন্যে আমার গর্ব্ব ছিল ; বাঘিনী যেমন ক'রে তার বাচ্চাকে আগলে বেড়ায়, আমিও তেমনই তোকে আগলে থাকতাম। আমি কি দেখি নি, তোর বয়স পাকবার আগেই ওই হতভাগার পীরিতে তুই মজেছিলি ? আমি কি জানি না, আস্তে আস্তে আজ ওটাই তোর পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ! কি, বিশ্বাস হচ্ছে না ? আজকে বিকেলেই যখন ওই বেশ্যামাগী, তোর ওই সাধের সইয়ের কুমতলবে ভুলে কাউকে কিছু না ব'লে ঘরের বাইরে গিয়েছিলি, তখনও আমি তোকে চোখে চোখে রেখেছিলাম—এটা জেনে রাখ্‌ ! বল্‌ তুই যাস নি। বাগানের কাছে গিয়ে ইচ্ছে ক'রে মনে পাপ নিয়ে ঘোমটা খুলিস নি ? নাগরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হবে, চোখ জ্ব'লে যাবে না তোর ? পিছু নিয়ে চলতে চলতে একবার তোকে হারিয়ে ফেললাম—হায় হায়, একটু হুঁশিয়ার থাকলেই হ'ত ! বাড়ি ফিরে খালি ঘর দেখে আমার কি বুঝতে দেরি হয়েছিল,

কোন্ সাপের গর্তে পাপকীট গিয়ে ঢুকেছে ? ওদের খিড়কির দরজা থেকেই আমি তোর কাছে কাছেই ছিলাম—এবং এই ঝড়জলের মধ্যে তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি তোর পিছু নিয়ে আসছি। তুই অসতী হয়েছিস—তোকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া নয়, আজকে রাত্রেই ছোরা শাণিয়েছি, তোকে নিকেশ ক'রে তবে ছাড়ব।

রাজমোহন থামিল, তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। মাতঙ্গিনীর অসাড় দেহখানার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে যেন শেষ দেখা দেখিয়া লইল। ক্ষণিক স্তব্ধতার মধ্যে বাহিরে ঝড়ের হাহাকার মাত্র শোনা গেল। অবশেষে মাতঙ্গিনী কথা বলিল—সে মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে, তবু অত্যন্ত ধীরভাবে বলিতে লাগিল, তোমার কথা ঠিক, আমি তাকে ভালবাসি, গভীরভাবে ভালবাসি—বহুদিন এ ভালবাসা আমার মনে বাসা বেঁধেছে। এ কথাও তোমাকে বলছি—আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম, নিজেকে সামলাতে পারি নি। সেই ভালবাসার উন্মাদনায়, তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবে না, আমার মুখ দিয়ে কয়েকটা কথা বেরিয়েছে এই মাত্র, এ ছাড়া আমি আর তোমার কাছে দোষী নই। আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় ?

রাজমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না। তোকে মেরেই ফেলব। ইহা বলিয়া সে কোমর হইতে বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত একটা ছুরিকা টানিয়া বাহির করিল। "মা, মা, বাবা গো, তোমরা কোথায় ?"—এই কথাগুলি মাত্র হতভাগ্য মাতঙ্গিনীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, পরক্ষণেই সে অচেতনের মত মেঝেতে পড়িয়া গেল। নিষ্ঠুর অস্ত্রখানি তাহার মাথার উপর ঝকঝক করিতে লাগিল—কম্পিতা মাতঙ্গিনীর বক্ষে তাহা প্রোথিত হইল বলিয়া। এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়িল, জানালায় কিসের ভয়ানক শব্দ হইল। রাজমোহন কারণ বুঝিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া দেখিল ঝাঁপ খুলিয়া গেল এবং খোলা পথে দুইটি কৃষ্ণকায় পালোয়ানের মত মূর্তি পর

পর লাফাইয়া ঘরে পড়িল। তাহাদের দেহ বৃষ্টিজলে আর্দ্র, কর্দ্দমাক্ত এবং তাহাদের ভয়াবহ রক্তচক্ষুর অন্তরাল হইতে যেন আগুনের হল্‌কা বাহির হইতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চোরের ওপর বাটপাড়ি

আগন্তুকদের একজন বলিল, আরে চোয়াড়, নিজের পরিবারকে খুন করবি নাকি? সে নিজে যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই, তাহা তাহার চেহারাতেই প্রকট হইতেছিল; তাহার হাতের ছোরাখানিও একবার ঝলকিয়া উঠিল।

রাজমোহনও গর্জ্জন করিয়া আগন্তুকদের দিকে ধাবিত হইল, প্রশ্ন করিল, কে তোরা? তাহার হাতের ছুরি দ্রুত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।— আমার ঘরে ডাকাতি!

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া আগন্তুকদের একজন উত্তর দিল, আস্তে, আস্তে; গোলমাল করলে তোমার ঘরের লোকেরাই জেগে উঠ্‌বে। ডাকাত নয় দোস্ত, একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখ, আমাদের চিনতে পারবে। তারপর মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওগো বাছা, একবার আলোটা এদিকে নিয়ে এস তো, দেখা যাক তোমার স্বামী তার বন্ধুদের মুখ মনে রাখতে পারে কি না!

কিন্তু মাতঙ্গিনীর তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান লুপ্ত না হইলেও সে মুহ্যমানের মত পড়িয়া ছিল, তাহার জীবনের উপর অতর্কিত আক্রমণ এবং এই অপ্রত্যাশিত বাধা দুইই তাহাকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল।

রাজমোহন বলিল, শত্রু হও, মিত্র হও, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে

—আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার পরিবারকে নিকেশ কর! দুঃসাহসী আগন্তুকের মুখ একটা পৈশাচিক হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। রাজমোহন উন্মাদের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আমার যা খুশি করব, আমাকে ঠেকাবে কে শুনি! এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া আগন্তুকের বুকে ছুরি বসাইতে উদ্যত হইল। আগন্তুক বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া গিয়া সে আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিল এবং নিজের বিশাল তরবারির এক আঘাতে রাজমোহনের হাতের ক্ষুদ্র অস্ত্র দশ হাত দূরে নিক্ষেপ করিল। নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে সে সজোরে লৌহমুষ্টিতে রাজমোহনের হাত চাপিয়া ধরিল। এতক্ষণ-পর্য্যন্ত-নীরব সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, ভিখু, আলোটা এদিকে ধর্ তো, আমার মুখটা ওকে দেখতে দে। বাপ রাজু, এ চাঁদ-মুখ বাবা, তোমার চন্দ্রবদনী স্ত্রী এ মুখ দেখলে খুশিই হবে। ভিখু প্রদীপ আনিয়া তাহার সঙ্গীর মুখের কাছে ধরিল।

রাজমোহন বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, সর্দ্দার! আগন্তুক জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, সর্দ্দার! যা হোক তবু চিনতে পারলে দেখছি! বন্ধুরা এত সহজে কি বন্ধুদের ভোলে?

রাজমোহনের রাগ কিন্তু ইহাতে প্রশমিত হইল না, সমান ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, তোমরা এখানে কেন? আমার বাড়িতে চড়াও হবার মানে কি?

—আগে বল, তোমার বউকে খুন করতে যাচ্ছিলে কেন।

—সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন? দেখ, ভালয় ভালয় বলছি কেটে পড়, সর্দ্দার-টর্দ্দার আমি মানি না, না গেলে লাথি মেরে বের করব।

সর্দ্দার ঠাট্টা করিয়া বলিল, বটে! কুলুপ-কলে তো প'ড়ে আছ, লাথি মারবে কে শুনি?

আমার পা এখনও স্বাধীন আছে।—বজ্রনির্ঘোষে এই কথা বলিয়া

রাজমোহন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন প্রচণ্ড পদাঘাত করিল যে, ডাকাত-সর্দ্দারের লোহার মত দেহও কয়েক পা পিছাইয়া গেল, এবং রাজমোহনের বদ্ধ হাত দুইটিও মুক্ত হইল।

রাজমোহন তাহার ছুরিখানির দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া সর্দ্দার চীৎকার করিয়া বলিল, ভিখু, ওকে ধর্, বেঁধে ফেল্।—হুকুম শেষ হইতে না হইতে ভিখুর ভীমবাহু রাজমোহনকে ধরিয়া ফেলিয়া ভূপাতিত করিল। সর্দ্দার ধূলিলুণ্ঠিত রাজমোহনের বুকের উপর বাঘের মত ক্ষিপ্র গতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সে যতক্ষণ এইভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখিল ততক্ষণ অন্যজন মাতঙ্গিনীর কাপড় টাঙাইবার আনলার বাঁশ হইতে দড়ি খুলিয়া শক্ত করিয়া তাহার হাত দুইটি বাঁধিয়া ফেলিল।

সর্দ্দার বলিল, বিশ্বাসঘাতক, তোমার প্রাণ এখন আমার হাতে।

—তা হতেই পারে, তোমরা দুজন, আমি একা। কিন্তু আমি কি করেছি যে, আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করছ?

—কি করেছ? বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তোমার ভায়রাভাইকে বাঁচাবার জন্যে তুমি কি তাকে আগে থাকতে সাবধান করনি! চুকলিখোর কোথাকার! সর্দ্দারের চোখ দুইটি রাগে জলিতে লাগিল।—তুমিই খবর পাঠিয়েছ, তোমাকে মরতে হবে।

রাজমোহন বলিল, আমি? আমি তাকে খবর দিয়েছি?

—আকাশ থেকে পড়লে দেখছি! তুমি নয় তো কে? বোকামি হয়েছে আমারই। বিশ্বাস করেছিলাম তোমার ভায়রার বিরুদ্ধে আমাদের তুমি সাহায্য করবে। তুমিও কম শয়তান নও। আমাদের সামনে মাধবের নামে তুমি যে সব কথা বলতে তাতেই তো তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম!

রাজমোহন তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সত্যি বলছি, আমি খবর দিই নি। সর্দ্দারকে সে ভাল রকমেই চিনিত বলিয়াই নিজের জীবন

সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা হইতেছিল।—বিশ্বাস কর, আমি একাজ করি নি। মনে করে দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গেই বাড়ি ছেড়ে গেছি এবং ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্যে তোমাদের সঙ্গ কি আমি ছেড়েছি?

—থাক থাক, ঢের চালাকি হয়েছে—ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছ আর কি! এই দেয়ালের পাশে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোমার স্ত্রী ঠিক ঘুমুচ্ছে কি না দেখবার জন্যে একবার ঘরের ভেতর আস নি তুমি? তাকে সব ব'লে তুমি তার হাত দিয়েই খবর পাঠিয়েছ, আমরা বুঝি না? বল যে, এও মিথ্যা। সে খবর না দিলে আর কে খবর দিতে পারে শুনি!

—স্বীকার করছি সেই খবর দিয়েছে, কিন্তু আমার অজান্তে। আমি যখন ঘরে ঢুকেছিলাম তখন সে সত্যি ঘুমুচ্ছিল। যে কোনও দিব্যি করতে বল করতে রাজি আছি।

সর্দ্দার রূঢ় কণ্ঠে বলিল, ঢের মিথ্যে বলেছ, আর নয়। তোমাকে চিনতে আর বাকি নেই। তোমার মতলব যদি খারাপই না হবে, মাধব ঘোষের বাড়ি থেকে হাঁক শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পালিয়ে এলে কেন? তোমার মতলব হাসিল হয়েছে, তখন আর থেকে দরকার? শোন বন্ধু, ঢের বয়েস হ'ল আমার, এত সহজে আমাকে ঠকাতে পারবে না। মরতে প্রস্তুত হও।

রাজমোহনের নিশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছিল। সর্দ্দারের বিপুল বপুখানি তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট শক্ত হইলেও আর অধিকক্ষণ সে গুরুভার সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও, ইষ্টদেবতার দিব্যি ক'রে বলছি—এ কথা ঠিক নয়, মায়ের দিব্যি, আমি কিছুই জানি না।

—তোমার স্ত্রীইবা এ কাজ করলে কেমন করে? সে তো ঘুমুচ্ছিল! এই প্রশ্ন করিয়া দস্যুসর্দ্দার রাজমোহনের বুক হইতে নামিয়া বসিল, কিন্তু

হাত দুইটি তাহার গলা হইতে নামাইল না—প্রয়োজন হইলে গলা চাপিয়া ধরা কঠিন হইবে না।

—সে হয়তো ঘুমের ভাণ ক'রে প'ড়ে ছিল।

—হা হা, খুব বোকা পেয়েছ আমাকে! আমি চেয়েছিলাম ঘরের দেওয়ালের পাশ থেকে দূরে গিয়ে পরামর্শ করতে, তুমিই বললে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে। কোনও কুমতলব না থাকলে তুমি তা বলবে কেন? তুমি মাধব ঘোষের কাছে আমাদের নামে লাগিয়েছ, কে জানে কালকে পুলিসের কাছে লাগাবে কি না! মাধব তোমাকে নিশ্চয়ই বাঁচাবার চেষ্টা করবে আর তুমি বেঁচে থাকলে আমাদের স্বস্তি নেই—খব পালিয়ে এসেছিলে, নইলে এতক্ষণ সাবাড় হয়ে যেতে!

রাজমোহন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা এখন ঘরে ঢুকে দেখলে কি? মাধবের কাছে খবর দেবার জন্যে যাকে পাঠিয়েছিলাম বলছ, আমি তাকেই খুন করতে যাই নি? তোমরা না এলে এতক্ষণ কোথায় থাকত সে?

—হুঁ। সর্দ্দার যেন একটু দ্বিধায় পড়িল, পরামর্শ চাহিয়া তাহার নির্ব্বাক সঙ্গীর মুখের দিকে সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

ভিখু বলিল, হাঁ সর্দ্দার, ও ঠিকই বলছে।

রাজমোহন তখন ভয়ে কাঁপিতেছে, সে বলিল, আমাকে যে কারণে তোমরা দোষী করছ, ঠিক সেই কারণেই আমি ওকে খুন করছিলাম।

সর্দ্দার লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, মাগী গেল কোথায়? ওকেই খুন কর। সে রাজমোহনের স্ত্রীকে রাজমোহনের শাণিত ছুরির নীচে যেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল সেখানে ছুটিয়া গেল। এক স্থানে কয়েকটা কাপড় গাদা করা ছিল, সেখানেও সে হাতড়াইতে লাগিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আলোকে স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছিল না।

—হতভাগী গেল কোথায় ? ভেবেছে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, সেটি হচ্ছে না বাবা, খুঁজে বের করবই তোকে।

রাজমোহনের কণ্ঠস্বর ততক্ষণে স্বাভাবিক হইয়াছে, সে বলিল, থাম, আমি ছাড়া আর কেউ আমার স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করতে পারবে না। আমার বাঁধন খুলে দাও।

সর্দ্দার ঘরের চারিদিকে দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছিল। সে ভিখুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভিখু, দড়িটা খুলে দে, আমি চুলের মুঠি ধরে ওকে বের করছি। ভিখু তরবারির আঘাতে রাজমোহনের হাতের বাঁধন কাটিয়া দিল। সর্দ্দার আর একটা কাপড়ের গাদায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, হেঃ, খালি কাপড়ই দেখছি। দাঁড়া মাগী, পালাবি কোথায় ?—ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিছানার পাশে আসিয়া সর্দ্দার তাহার উপর যথেচ্ছ হাতিয়ার চালাইতে লাগিল কিন্তু মাতঙ্গিনী কোথায় ?

সর্দ্দার হাকিল, ভিখু, বাতিটা নিয়ে আয়, তক্তপোশের তলায় লুকুল কি না দেখি।—ভিখু আলোটা বেশ করিয়া উস্কাইয়া লইয়া আসিল, রাজমোহনও পিছনে পিছনে আসিল ; হামাগুঁড়ি দিয়া তিনজনেই দেখিল, কেহই সেখানে নাই।

বাতিটা উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহারা ঘরের আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র খোঁজ করিল কিন্তু মাতঙ্গিনীকে দেখিতে পাইল না। রাজমোহন দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, দরজার দিকে চেয়ে দেখ, খোলা না ? আমি ঘরে ঢুকে হুড়কো বন্ধ করেছিলাম। হতভাগী পালিয়েছে।

মাতঙ্গিনী সত্যই পলাইয়াছিল। সর্দ্দার ও তাহার স্বামী যখন পরস্পরের প্রাণ লইয়া ঘোর যুদ্ধে মত্ত ছিল তখন তাহার কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না। এই দুই বর্ব্বর অপেক্ষা হৃদয় যাহাদের অল্প কঠোর তাহারা মাতঙ্গিনীকে একবার দেখিলে তাহার কথা ভুলিতে পারিত না।

অলক্ষিতভাবে মাতঙ্গিনী দরজা পর্য্যন্ত গিয়া সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—শব্দ যদি কিছু হইয়াও থাকে যুদ্ধরত দুই মহাবীরের আস্ফালনে তাহা কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সর্দ্দার ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওকে ধরা চাই, নইলে ও আমাদের সর্ব্বনাশ করবে।

রাজমোহন বলিল, হ্যাঁ, তাই চল, কিন্তু সাবধান আমার স্ত্রীর গায়ে কেউ হাত তুলোনা, তাকে তোমরা ধর কিন্তু খুন করতে হ'লে আমিই করব ; আমি যদি তা না করি তোমরা আমাকে মেরে ফেলো। আর কেউ যেন ওকে না ছোঁয়। চল, আমিই আগে আগে যাচ্ছি।

তিনজনেই দ্রুত বাহির হইয়া গেল। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন ছিল, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল। সর্ব্বত্র পলাতক সুন্দরীর অনুসন্ধান করা হইল। এদিকে প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল না, সময় অত্যন্ত কম।

প্রথমেই রাজমোহন কনকের বাড়ি গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবে ঠিক করিল। সর্দ্দার ও সে পা টিপিয়া টিপিয়া কনকের কুটীর পর্য্যন্ত গেল, তারপর দাওয়ায় উঠিয়া ঝাঁপ তুলিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল, আলোকের অভাব সত্ত্বেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল, মা ও মেয়ে ঘুমাইতেছে।

আশেপাশের ঝোপে ঝাড়ে খোঁজা হইল, কিন্তু কোনও সন্ধান মিলিল না। মেঘাচ্ছন্ন সিক্ত প্রত্যূষের স্থলে রৌদ্রময় লোহিতাভ প্রভাতের সূচনা দেখা গেল, দস্যুরা আর অধিকক্ষণ বাহিরে থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। তাহারা রাত্রিতে কোথায় মিলিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া লইয়া পরস্পর পৃথক হইল। সর্দ্দার একথা জানাইতে ভুলিল না যে, রাজমোহন যদি অনুপস্থিত হয় তাহা হইলে—বাক্যটি সমাপ্ত না করিয়া সে একটি কুৎসিত শপথ উচ্চারণ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুসমাজে আগন্তুক

সদ্য বারিধারায় স্নাত প্রভাত মনোহর প্রাণচঞ্চল নবীনতায় ঝলমল করিয়া উঠিল। ভাসমান মেঘপুঞ্জকে পশ্চাতে ফেলিয়া তরুণ তপন ক্রমশ উর্দ্ধগামী হইতে লাগিলেন ; নীলোজ্জ্বল অনন্ত আকাশ-প্রান্তরে গতিশীল সূর্য্য ; গৃহচূড়া এবং বৃক্ষচূড়া—নারিকেল ও খর্জ্জুর শাখা, আম ও বাবলা গাছগুলি যেন অপরূপ আলোক-বন্যায় স্নান করিয়া হাসিতে লাগিল। বৃক্ষ-লতার পাতায় পাতায় পতনোন্মুখ জলবিন্দু প্রভাতসূর্য্যের তির্য্যক রশ্মিস্পর্শে লক্ষ লক্ষ মুক্তাবিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। বৃক্ষকুঞ্জের ঘনসন্নিবিষ্ট শাখার অবকাশপথ দিয়া মৃদু রশ্মি নিম্নের আর্দ্র তৃণভূমির উপর যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সদ্যোজাগ্রত ও আনন্দিত পক্ষীকুল তাহাদের সহস্র কণ্ঠের কোলাহলে বনভূমি মুখর করিয়া তুলিল ; শুধু থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়ার সুমিষ্ট কুহুধ্বনি স্পন্দমান বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। লঘু পেঁজা তুলার মত সাদা মেঘ আকাশের সদ্য-পরিশুদ্ধ নীলে নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করিতেছিল ; দোদুল্যমান ব্যাকুল শাখাগ্রবর্ত্তী জলবিন্দু ঝরাইবার জন্যই যেন একটা মৃদু বাতাস সহসা উত্থিত হইয়া আকাশের নিঃসঙ্গ মেঘমালাকে দোলাইতে লাগিল।

পাঠক, আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া গত রাত্রে মাতঙ্গিনী যে পুকুরের পাড়ে ক্ষণিকের জন্য বিপন্ন হইয়া আবার বিপদ্‌মুক্ত হইয়াছিল, সেইখানে আসুন। সূর্য্যদেব আকাশমার্গে এক প্রহরের পথ অতিক্রম করিয়াছেন। একটি অনতিপ্রাচীন তেঁতুলগাছের নীচে লতাগুল্মের আচ্ছাদনে মাতঙ্গিনী ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া ছিল। তাহার বস্ত্র সিক্ত, কর্দ্দমাক্ত, বৃষ্টি-বিধৌত কুঞ্চিত কেশদাম আলুলায়িত হইয়া গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার স্কন্ধদেশ ও বাহু দুইটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে মস্তক ঈষৎ আনত করিয়া ঘন

মেঘের চাইতেও কালো কেশ সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া লইতেছিল। পাশেই যৌবন-পরিপুষ্ট পূর্ণাঙ্গী কনকের দেহ সদ্য তৈলমাজ্জিত হইয়া মসৃণ দেখাইতেছিল। তাহার কাঁধে ময়লা একটি গামছা—সুবৃহৎ পিতলের কলসিটি পাশে খালি পড়িয়া ছিল; মিশি-প্রয়োগে-মলিন দাঁতগুলি ইহাই বলিয়া দিতেছিল যে, প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে কনক ঘরের বাহিরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহা বাকি আছে। দুই সখীতে গভীর কোনও বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাহাদের বার্ত্তালাপের বিষয় আমাদের অজ্ঞাত নহে। মাতঙ্গিনী তাহার একমাত্র বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমতী সখীর নিকট বিগত রাত্রির ঘটনা-পরম্পরা মৃদুস্বরে বিবৃত করিতেছিল। পাঠকের অনুমতি লইয়া এই কথোপকথনের শেষাংশ তাঁহার অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি।

কিছুক্ষণ অবাকবিস্ময়ে এই বর্ণনা শুনিয়া কনক শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, মাগো, আমি হ'লে তো ভয়েই ম'রে যেতাম। ধন্যি সাহস তোর, দিদি। আচ্ছা, এখন তুই তোর বরের কাছে ফিরে যাবি?

মাতঙ্গিনী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, আর কোথাই বা যাব!

কনক অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাস দিদি, সেখানে আর ফিরিস না। তারা তোকে জ্যান্ত রাখবে না।

মাতঙ্গিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মরতে আমাকে হবেই ভাই, অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে? আর কোথায় আমি আশ্রয় পেতে পারি, বল্।

বন্ধুর দুঃখে সহানুভূতিতে কনকের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে বলিল, আমি বেশ বুঝছি দিদি, আমাদের বাড়িতে থাকা তোমার চলবে না। কিন্তু বাড়িতে তুমি কিছুতেই ফিরো না। হ্যাঁ, তোমার বোনের কাছে যেতেই বা তোমার আপত্তি কি?

এই কথায় মাতঙ্গিনীর দেহে এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর ঘটিল। উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া যে কঠিন সংযত ভাষায় সে মাধবের কাছ হইতে বিদায়

লইয়াছিল, কথায় তেমনই জোর দিয়া সে বলিল, অসম্ভব, এ জীবনে আর সেখানে যেতে পারি না।

মাতঙ্গিনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া কনক আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, আরে বেটীরা, এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কি পরামর্শ হচ্ছে শুনি! আহা, তোমরা কাঁদছ, কেন, কি হয়েছে মা?

ভয়চকিত সখীদের পাশে আসিয়া যে দাঁড়াইল সে একজন শ্যামাঙ্গী প্রৌঢ়া রমণী। তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে। দেহ বার্দ্ধক্যবশত কুঞ্চিত হইতে শুরু হইয়াছে। তাহার পরনে একটা মোটা পরিষ্কার ঠেঁটি, মুখ তৈলাক্ত, কাঁধে মলিন গামছা, এবং কোমরের খালি কলসি তাহার সেখানে আগমনের কারণ বলিয়া দিতেছিল।

কনক একমুহূর্তে চোখের জল ভুলিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল-মুখে সে বলিয়া উঠিল, আরে, এ যে দেখছি, সুকীর মা। হ্যাঁ সুকীর মা, ফুলপুকুরে আজ যে বড় হঠাৎ এলে?

সুকীর মা অত্যন্ত প্রসন্নভাবে উত্তর দিল, উঠতে আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল মা, ভাবলাম, যাই, ঘরের কাজে হাত দেবার আগে চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি। কিন্তু, বাছা তোদের কি হয়েছে বল্ তো? দুজনেই কাঁদছিস কেন?

কনকের চোখ দুইটি আবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, সে বলিল, আর বলো না, সুকীর মা! এ হতভাগীর দুঃখের কথা তোমাকে আর কি বলব! মাতঙ্গিনী নীরব অর্থপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কনককে সাবধান করিয়া দিল—সেই দৃষ্টি যেন বলিল, আমার দুঃখের কথা যাহাকে তাহাকে বলিবার নয়, কিছু প্রকাশ করিও না। কনকও তেমনই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জবাব দিল, ভয় নাই, তোমার গুপ্তকথা ব্যক্ত হইবে না।

কনক আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওর দুঃখের কথা আর বলো না। হতভাগিনীকে ওর স্বামী ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, এখন ও কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে তাই ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না।

সুকীর মা বলিল, আরে ছ্যা, এতেই কান্না! স্বামীস্ত্রীতে সকালে ঝগড়া করে, সন্ধ্যেয় আবার তাদের মিল হয়—এ তো সবাই জানে। এখন তার রাগ আছে, রাগ পড়লেই সে সেধে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ছিঃ মা, এর জন্য কান্না কেন? জানিস কনক, আমার জামাই যখন শ্বশুর-ঘর করতে আসে, এমন একটা রাত যায় না যখন আমার মেয়ের সঙ্গে সে ঝগড়া করে না। কিন্তু তাতে কি, তাই ব'লে, আমার মেয়েকে সে কোনও স্বামীর চাইতে কম ভালবাসে না। এই গেলো বুধবারের কথাই ধর। জামাই তো এল চমৎকার একটা সোনার নথ নিয়ে —এমন নথ, তোকে কি বলব কনক—

কনক কিন্তু সুকীর মায়ের জামায়ের মিষ্টি স্বভাবের পরিচয় সম্পূর্ণ করিতে দিল না, সে মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, যা বলেছ ঠিক সুকীর মা, কিন্তু এ আলাদা ব্যাপার। রাজুদা আর একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়—সেই যে জঙ্গলবেড়ে থেকে সম্বন্ধ এসেছিল সেই মেয়ে। এখন বুঝতেই পারছ, একে বার বার এমনভাবে যন্ত্রণা সে দিচ্ছে কেন। এ আর স্বামীর ঘর করতে যাবে না, সুকীর মা। আর এমনভাবে কারও যাওয়া উচিতও নয়। সেখানে গেলে অপমান আর দুর্ব্বাক্য ছাড়া আর কিই বা জুটবে? এর জন্যে ফিরে যাবে ও! আবার এদিকে কোথায় যে যাবে তারও ঠিক নেই—হতভাগীর বাপের বাড়ি কাছে হ'লেও বা কথা ছিল, তারা তো আর ঠেলতে পারত না।

সহৃদয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, পোড়া কপালই বটে। তুই ঠিকই বলেছিস কনক, এমন হ'লে কিছুতেই আর ওর ফিরে যাওয়া উচিত নয়।

আবার বিয়ে করবে? বলি, এমন সোনার চাঁদের মত বউ কোথায় পাবে সে? আর একটা কচি মেয়েকে ঘরে আনলেই সে কি ঘর-গেরস্থালী সামলাতে পারবে? না মা, তুমি ঘরে ফিরো না, বরঞ্চ তোমার বোনের ঘরে গিয়ে দেখ ও কি করে।

কনক বলিল, তাই কি হবার জো আছে সুকীর মা, বোনের ঘরে যাওয়ার মুখও ওর নাই। মাতঙ্গিনী লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হইয়া রহিল। কনক বলিতে লাগিল, মাধববাবু তাদের বাড়িতে গেল শ্রাদ্ধের সময় রাজুদাকে নেমন্তন্ন করে নি বলে ও ওর বোনের সঙ্গে কি কম ঝগড়াটাই করেছে! আমাদের বাড়িতেই ওকে রাখতে পারতাম, কিন্তু জানই তো সুকীর মা, আমরা কত গরিব। ওকে নিয়ে যাব, আর ও উপোস করে মরবে। এটাই কি ভাল?

সুকীর মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, মরণ! কি বোকা মেয়ে তুমি বাছা। অমন স্বামীর জন্যে বোনের সঙ্গে ঝগড়া করা! হ'ত আমার জামাই—আমি কি শুধু তাকেই কথা শোনাতাম! তার বাপ মারও কি রক্ষে থাকত নাকি? মরুকগে, আয় মা, তুই আমার সঙ্গে। বিপন্ন ও স্তব্ধ মাতঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আমার সঙ্গে এসো, আমাদের গিন্নীর সঙ্গে যতদিন খুশি তুমি থাকবে। বড় ঠাকরুণ তোমাকে বড্ড ভালবাসেন, তোমাকে পেলে তিনি খুশিই হবেন। তারপর তোমার স্বামীর রাগ পড়লে, তা সে শিগগিরই পড়বে, তোমাকে বাড়িতে যেতে সাধাসাধি করলে তবে তুমি যেয়ো। দেখো, যেন চট করে আবার তার কথায় ভুলে যেয়ো না; নাকের জলে চোখের জলে হয়ে দাঁতে খড় কেটে সে তোমাকে নিয়ে যাবে, তবে যাবে তুমি।

কনকের আনন্দ আর ধরে না, উল্লসিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ সুকীর মা, ও তোমার সঙ্গেই এখন যাক। কি বলিস দিদি? সুকীর মায়ের সঙ্গে যাওয়াটাই কি সব চাইতে ভাল হবে না?

আমি জানি, বড় ঠাকরুণ তোকে ভালবাসেন। তুই গেলে তিনি খুশিই হবেন। চুপ করে আছিস কেন দিদি, কথা বল্‌।

মাতঙ্গিনী যেন বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল, কিন্তু মুখরা কনক সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও যাবে। তুমি যাও সুকীর মা, চানটা সেরে এস, তোমার সঙ্গে এখনই ও যাক। যাও, দেরি ক'রো না।

সুকীর মা আর বিলম্ব না করিয়া স্নান করিতে গেল। মাতঙ্গিনী বলিল, এত ও আমার কপালে ছিল, কনক।

কনক উত্তেজিত হইয়া জোরের সঙ্গে বলিল, 'না' ব'লো না দিদি, এতে মত না দিলে তুমি আমার রক্ত খাবে। এখন যাও, সন্ধ্যে বেলায় আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। আর কথা ব'লো না।

কনক আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কলসী তুলিয়া লইল এবং দ্রুতপদে জলের ধারে গিয়া সুকীর মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে নামিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়দাত্রী

মথুর ঘোষের বাসভবন পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধির সহিত পরিচ্ছন্নতার অভাবের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বহুদূরবিস্তৃত ধানের ক্ষেতের ওপার হইতে বৃক্ষশাখাপত্রের অবকাশ-পথ দিয়া বাড়িটির ছাদের আলিসা ও কালো প্রাচীর নজরে পড়ে। কাছে আসিলে দেখা যায় যে স্থানে স্থানে প্রাচীন চুন-বালির সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদ জরাজীর্ণ পুরাতন ইষ্টক-ভিত্তি ত্যাগ করিয়া খসিয়া পড়িবার

মতলব করিতেছে, কোথায়ও বা একটা বিশ্রী রঙ-ওঠা জানালার পাল্লা একটি কব্জা মাত্র আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে গত বৎসরে অন্তর্হিত সঙ্গী অপর পাল্লাটির বিরহে কাতরতা প্রকাশ করিতেছে ; কোনও কোনও জানালায় কব্জা বা পাল্লার চিহ্নমাত্র নাই ; নীচজাতীয় টাটের পরদা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সেই সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্ভাগের সামান্য স্থানেই চুনবালির প্রলেপ পড়িয়াছিল। চুনবালি-শোভিত অপেক্ষাকৃত ভাগ্যসম্পন্ন অংশ, মথুর ঘোষ স্বয়ং না হউন্ তাঁহারই মত মহামহিমান্বিত কেহ যে অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই ; এখানে খুঁজিলে ভিনিসিয়ান খড়খড়ির দুই একটা টুক্‌রা যে না মিলিবে তাহা নয়, কিন্তু দৈত্যের মত ওই বাড়ীটা ওরূপ সূক্ষ্ম অলঙ্কারে শোভিত হইতে প্রস্তুত ছিল না। এই অট্টালিকার বহির্ভাগের অধিক অংশেই চুনবালির ছোঁয়াচ লাগে নাই অনাবৃত ইষ্টকস্তূপের উপর ধূলাকাদা ও কালিঝুলির প্রলেপ পড়িয়া একটা বীভৎস সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে সেখানে ইটের দেওয়াল ফুঁড়িয়া এক-আধটা তরুণ বট অথবা অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর কোনও গাছ মাথা খাড়া করিয়া যেন কোনও পারস্য-সম্রাট-কল্পিত শূন্যস্থিত উদ্যানের একটি ছোটখাট সংস্করণ গড়িয়া তুলিবার বাসনা করিতেছিল।

বাড়ীটি চারিটি সম্পূর্ণ পৃথক মহলে বিভক্ত। সম্মুখ দিয়া ঢুকিতে গেলেই এক জোড়া ভারী লোহার পাতমোড়া আলকাতরামাখানো কবাট পার হইতে হয়, তাহার পরেই প্রশস্ত উঠান। উঠানের তিন দিক দোতলা বারান্দা দিয়া ঘেরা—বারান্দা খুব উঁচু নয়। তোরণের ঠিক বিপরীত দিকেই পাঁচ খিলানের উপর দণ্ডায়মান সুপ্রশস্ত হল-ঘর। হল-ঘরের ভিতর-বাহির সর্ব্বত্রই চুনবালির কাজ করা, কিন্তু বহু বর্ষার অত্যাচারে সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে কিঞ্চিৎ রঙের সমাবেশ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে ছাদের জলনিকাশের জন্য পাইপ বসানো

ছিল, সেই সেই স্থান একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। হল-ঘর হইতে অন্দর-মহলে যাইতে হইলে গোলকধাঁধার মত অন্ধকার ও স্যাঁৎসেঁতে অনেকগুলি কামরা পার হইয়া যাইতে হয়। অন্দরমহলটা চকমিলান বাড়ি; মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চারিপাশে পূর্ব্বের মতই বারান্দা। চুনবালির কাজ এখানেও আছে, কিন্তু অধিকাংশ থামের নগ্নমূর্ত্তি কালের প্রকোপে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ির শিশুরাও এই কার্য্যে কম সহায়তা করে নাই। উপরের এবং নীচের সকল ঘরের দেওয়ালেই অসংখ্য লাল সাদা কালো সবুজ চিহ্ন, এক কথায় রামধনুর সাতরঙে রঙিন। অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে রসস্থ মুখের ভার-লাঘবকারী পিচে, অথবা চিন্তালেশহীন কোনও দাসীর কর্দ্দম-আধারের ভার সহিতে না পারিয়া গোলা-হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলিবার ফলে অথবা পানসাজা রূপ সুখকর কাজের ভার যাহার উপর, দেওয়ালকে তোয়ালে ভাবে ব্যবহার করিয়া তাহার কাজের পরিচয় অঙ্গুলিচিহ্নরূপে ঘন ঘন দেওয়ালের গায়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই এরূপ হইয়াছে। কয়লার সাহায্যে অঙ্কিত বহু চিত্র, এঞ্জেলোর কল্পনা অথবা গুইডোর বর্ণগৌরব না থাকিলেও দুষ্ট বালকদের সময় নষ্ট করিবার অথবা বুদ্ধিমতী বালিকাদের ক্ষণিক প্রহরযাপনের প্রচেষ্টার সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। উঠানে ইট বা টালির বালাই ছিল না, জননী বসুন্ধরা সকল প্রকার উদ্ভিজ্জগৌরবে শোভমানা ছিলেন। গৌরবটা বেশি ছিল চারিটি কোণে। উঠানের মাঝখানে এদিক ওদিক চারিদিকে যাওয়ার পথ। সংসারের মত আবর্জ্জনা আর ময়লা জল মিলিয়া ঘন কালো হইয়া উঠানের একদিকে যেন যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্রাম করিতেছে—সে কালোর তুলনা নাই।

এখান হইতে একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়া অপরিসর অথচ দৃঢ় একটি দরজা পার হইলেই বাড়ির তৃতীয় মহল। এখানেই রান্নাঘর, দুই দিকে সারি সারি একতলা কতকগুলি কুঠরি, মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, উদ্ভিজ্জগৌরবে

পূর্ব্বের প্রাঙ্গণ হইতেও সমৃদ্ধ। এখানে ধরিত্রীজাত শাক্‌সব্জির উপর যে অকথিত অত্যাচার প্রত্যহই অবিরত করা হইতেছে তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান; সলিলনিবাসী মীনজাতীয় জীবেদের উপর এই বিভাগের কর্ত্রী-ঠাকুরাণীরা যে অত্যাচার করেন, তাহারও চিহ্ন রহিয়াছে। অপ্রতিহত গৌরবে যুগযুগসঞ্চিত ঝুল এখানে রাজত্ব করিতেছে।

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ মহল রান্নাঘরের পিছনে অবস্থিত, কিন্তু এদিক হইতে ও-মহলে প্রবেশ করিবার সকল পথই অবরুদ্ধ। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে যাহারা কদাচিৎ এই মহলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা খুব কম।

পুরুষেরা এই মহলটিকে গুদাম-মহল বলিত। বাহির হইতে গুদাম-মহলে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র দরজা—অত্যন্ত স্থূল, প্রায় নিরেট। এই মহলের তিন দিকে খাড়া উঁচু প্রাচীর, বাহিরের কেহ যাহাতে বাড়ির এই অংশে সহসা প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য এই প্রাচীরের উপরিভাগ বোতলের ভাঙা কাচ দিয়া দুর্গম করা হইয়াছে। চতুর্থ অর্থাৎ বাকি দিকে সারি সারি একতলা কতকগুলি ঘর। প্রত্যেক ঘরের দেওয়াল অসম্ভব রকম পুরু, দরজাগুলি ছোট, কিন্তু লোহার পাতমোড়া; জানালার বালাই কোনটিতেই নাই। সম্ভব অসম্ভব সকলপ্রকার দ্রব্য সুরক্ষিত রাখিবার জন্য এই গুদাম-ঘরগুলি ব্যবহৃত হয় সকলে এইরূপ জানিত। বাড়িটির এক দিকে সুপ্রশস্ত সুপারিবাগান, মাঝে মাঝে বকুলগাছ, চতুর্দ্দিক ইষ্টক-প্রাচীর দিয়া ঘেরা এবং ঠিক মধ্যস্থলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ একটি পুকুর। এই অংশটিকে বাড়ির খিড়কি বলা হইত। রন্ধনশালার নিকট দিয়া এই অংশে আসিতে হয়, ইহার পরই আর একটি দরজা পার হইলেই গৃহসংলগ্ন উদ্যান।

পাঠক, আসুন, আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমরা এতক্ষণ যে সুবৃহৎ অট্টালিকার পরিচয় দিতেছিলাম, তাহারই দ্বিতীয় মহল অর্থাৎ

অন্দর-মহলের দ্বিতলে গমন করি। সিঁড়ি অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং অন্ধকার; নিরেট ইটের স্তূপ ধাপে ধাপে উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা পাঠককে দুর্গম ও দুরতিক্রম্য আর এক রাজ্যে যাইতে আহ্বান করিতেছি—স্বয়ং মথুর ঘোষের শয়ন-কক্ষে তাঁহাকে যাইতে হইবে। এই কক্ষের প্রাচীরগাত্রের পালিস-করা চুনবালির আবরণ যথাসম্ভব পরিষ্কার আছে, দুই-এক স্থলে যে ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট হয় নাই তাহা নহে; এখানে ওখানে দুই-একটা কলঙ্কের দাগ, ক্বচিৎ দুই-একটা আঁচড়ও দেখা যাইতেছে। এই কক্ষের এক দিকের একটা কোণ ঘেঁষিয়া অনাবৃত মেঝের উপরে সেগুনকাঠের একটা ভারী এবং উঁচু খাট দাঁড়াইয়া আছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত ফ্রেমটির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন ভাবে একটা ডোরাকাটা জালি-পরদা চারিপাশে মাটির উপর পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে। কাঠের কয়েকখানা বিপুলকায় আলমারি এবং চেস্ট-অব-ড্রয়ার্স‌ও ছিল; কালের প্রকোপে ও অযত্নব্যবহারে সেগুলির বার্নিশ বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এগুলি ঠিক পালঙ্কটির বিপরীত দিকে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিরাজ করিতেছিল। একটি কি দুইটি ড্রয়ারসমন্বিত লিখিবার টেবিল, কয়েকটি অতি সাধারণ গ্রাম্য বাক্স ও সিন্ধুক, তাহাদের ডালার চারিটা ধার মোটা মোটা পিতলের পাত দিয়া মোড়া এবং মধ্যে মধ্যে চন্দনকাঠের টুকরা বসানো—ইহাই হইল সেই কক্ষটির কাঠের আসবাবের সম্পূর্ণ পরিচয়। বিপরীত দুই দেওয়ালের মাথা হইতে পরস্পর মুখামুখি ভাবে দুইটি সুবৃহৎ চিত্র ঝুলিতেছিল—একটি মা কালীর কালো মূর্ত্তি এবং অন্যটি মা দুর্গার ছবি, দূর হইতে দেখিলে এটি কাঁকড়ার ছবির মত বোধ হয়।

অন্য দুই বিপরীত প্রাচীরগাত্রে করালবদনী কালী ও ভগবতী দুর্গার মত অত উঁচুতে নয়, দেওয়ালের মাঝামাঝি সারি সারি ইউরোপীয় শিল্পকলার কয়েকটি নমুনা রক্ষিত ছিল। কুমারী মাতা মেরী ও তাঁহার শিশু সম্পর্কিত অপরূপ শিল্প যে-কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল তাহার অধিবাসীরা

শিল্পীর প্রতিভা অথবা খোদাইকরের কলা-কৌশল যথার্থ কি প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই কক্ষে একটি জানালার ঠিক পাশে একটি রমণী উপবেশন করিয়া ছিলেন—তাঁহার বয়স আটাশের কাছাকাছি হইবে। তাঁহার মুখ এবং গড়ন এখনও সুন্দর বলা যায়। তাঁহাকে শ্যামাঙ্গী বলিতে হইবে; তাঁহার চক্ষুদ্বয় আয়ত ও ভ্রমরকৃষ্ণ, মৃদু অথচ হাস্যোজ্জ্বল, একটা জ্যোতি সে দুটিতে জ্বলজ্বল্ করিতেছিল। ইহা ছাড়া এই রমণীর আর কিছু বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত ছিল না, কিন্তু মোটের উপর তাঁহার দেহে এমন একটা মাধুর্য্যের বিকাশ দেখা যাইতেছিল, যাহা তাঁহার সহজাত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই মাধুর্য্য তাঁহার অঙ্গ ছাড়িয়া যায় নাই। তাঁহার সুডৌল দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া একটি পরিষ্কার শাড়ি শোভা পাইতেছিল, কিন্তু মহিলাটির মস্তকে কোনও আবরণ ছিল না। সদ্যস্নানসিক্ত উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশদাম আলুলায়িত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, চিরুনির সাহায্যে তাহা সংস্কৃত হয় নাই, বিশৃঙ্খল বলিয়াই যেন অধিকতর মনোহারী বোধ হইতেছিল; সচরাচর যে রকম ভারী ভারী গহনা আমাদের চোখে পড়ে, তাহা অপেক্ষা হালকা সুবর্ণ অলঙ্কারে তাঁহার কান, গলা, বুক, বাহু ও প্রকোষ্ঠ শোভিত ছিল। যে কারণেই হউক, তাঁহার নাসিকারন্ধ্র ও গণ্ডদেশে নথের সূক্ষ্ম এবং হালকা বৃত্তটি শোভা পাইতেছিল না, কিন্তু পায়ের যথাস্থানে থাকিয়া মলগুলি রুনুঝুনু করিতেছিল। জানালার চৌকাঠে মানুষের চুলের কয়েকটি গুচ্ছ ঝুলিতেছিল—রমণীর অঙ্গুলিগুলি ইহাদের সাহায্যে কিশোরী বালিকাগণের কাম্য বিনুনির গোছানির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিল। দশ বছরের একটি বালিকা তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট ছিল। তাহার অপরূপ সুন্দর মুখশ্রীতে বয়স্কা রমণীটির মুখের আদল খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নয়। বালিকা যেরূপ ব্যাকুলভাবে তাহার মায়ের শিল্পনির্ম্মাণকার্য্য দেখিতেছিল তাহাতে বোধ হয় যে, তাহারই উন্মত্ত কেশপাশকে বন্ধনদশায় দেখিবার জন্যই তাহার মাতার এই মধুর পরিশ্রম।

ইহাদের নিকট হইতে একটু দূরে বিনম্রভাবে আর একটি স্ত্রীলোক উপবিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়াছে, মনে কোনও গভীর দুঃখ বাসা বাধিয়াছে। এই রমণী কে, সহৃদয় পাঠককে নিশ্চয়ই তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সুকীর মা, শাশুড়ী-জগতে তাহার স্থান যে কতখানি উচ্চে তাহার নিজের ভাষাতেই পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। সুকীর মা তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত মাতঙ্গিনীকে তাহার কর্ত্রীঠাকুরাণী অর্থাৎ মথুর ঘোষের প্রথমা পত্নীর নিকটে হাজির করিয়া দিয়াছে। তিনি তাঁহারই নিমিত্ত চুলের গুছি প্রস্তুত করিতেছিলেন।

মথুরের গৃহিণী ও মাতঙ্গিনীতে অত্যন্ত নিম্ন স্বরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সুকীর মা অদূরে বসিয়া আপনার মনে বকর্ বকর্ করিয়া যাইতেছিল— উভয়ের কাহাকেও সে বাধা দিতেছিল না। এই কথোপকথন অথবা বকুনি বিস্তৃতভাবে পাঠককে শুনাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে, তিনি অনুমানে ইহাদের কথাবার্ত্তা কি ধরনের হইবে তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন। কনকের মিথ্যা গল্প হইতে সুকীর মা হতভাগিনী পলাতকা মাতঙ্গিনী সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ আহরণ করিতে পারিয়াছিল, তাহার উপর নিজের কল্পনার অনেক-খানি রঙ চড়াইয়া, অনেকগুলি ভাল ভাল প্রক্ষিপ্ত বর্ণনা যোগ করিয়া দিয়া তাহার দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্রীঠাকুরাণীকে ওয়াকিবহাল করিয়া দিয়াছে। পরিশেষে নিজের সুখী কন্যার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বিবাহিত জীবনের সুখ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেও সে ছাড়ে নাই। সহৃদয়া বৃদ্ধা ঠিকই বিচার করিয়া দেখিয়াছিল যে, এই সকল অতিরঞ্জন বা প্রক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাহার মক্কেলের কোনই ক্ষতি হইবে না, অথচ তাহার নিজের বাকচাতুর্য্য দেখাইবার যথেষ্ট অবকাশ সে পাইবে। এই বৃদ্ধার সম্মুখেই আসল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিবার সাহস মাতঙ্গিনীর হইল না। ভাল মানুষ

সুকীর মা যতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে গল্প বলিয়া গেল, সে নীরবে বসিয়া শুনিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা প্রতিবাদে সুকীর মার প্রায় সকল কথাই মানিয়া গেল। মনে মনে সে ইহা স্থির করিয়া লইল যে, যদি প্রয়োজন হয়, যদি তাহাকে অধিক দিন ধরিয়া এই নবপরিচিতার দয়ার আশ্রয়ে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনও সময়ে তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেই চলিবে—অবশ্য তাহার স্বামী যে হীনতার মধ্যে ডুবিয়াছেন, যতদূর সম্ভব সে সংবাদ গোপন করিয়াই চলিতে হইবে।

মথুরের স্ত্রী যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন; তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদারতা, শুদ্ধমাত্র শুষ্ক ভব্যতা নয়, মাতঙ্গিনীর নিকট ইহা স্পষ্ট করিয়া দিল যে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন না, নিমন্ত্রণ করিয়া কাছে রাখিতে চাহিতেছেন। অবশ্য মাতঙ্গিনী এই বাড়ির একজন হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একটি কাজ করিতে হইবে। মথুর-বাবুর অনুমতি এ বিষয়ে আবশ্যক। স্বামীর নিকট এই অনুমতি প্রার্থনা করিবার অভিলাষে একবার এক মিনিট তাঁহাকে ভিতরে আসিবার অনুরোধ জানাইবার জন্য সুকীর মাকে সদরে পাঠাইলেন। বৃদ্ধা তখনও তাহার কন্যার স্বামী-সৌভাগ্য সম্বন্ধে বক্তৃতায় ক্ষান্ত দেয় নাই। স্বামীকে কি জন্য ডাকিতেছেন তাহা তিনি মাতঙ্গিনীর নিকট ভাঙিলেন না। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার স্বামী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তিনি মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন। মাতঙ্গিনীর পক্ষে আর সেখানে বসিয়া থাকা রীতিবিগর্হিত, সুতরাং সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গৃহস্বামীর অপলক চোখে পরিচয় ও বিস্ময়ের একটা দৃষ্টি সে যেন দেখিতে পাইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দাম্পত্য-কলহ সম্বন্ধে গবেষণা—আক্রমণ ও সন্দেহজনক আত্মসমর্পণ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, মথুর ঘোষ দুই বিবাহ-বন্ধনজনিত সৌভাগ্য-সুখ অথবা দুর্ভাগ্য-পীড়ার মধ্যে, দুই পত্নীর দাসত্ব বা প্রভুত্ব অথবা দুইই করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিল। জ্যেষ্ঠা তারার পরিচয় আমরা দিয়াছি; কনিষ্ঠা চম্পক, বয়সে তারা অপেক্ষা অন্তত আট বছরের ছোট। কি দেহসৌষ্ঠবে কি বর্ণগৌরবে সপত্নী অপেক্ষা সে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তদুপরি স্বভাবতই চপল সৌন্দর্য্যের মায়াজাল বিস্তারে সে পটু ছিল, তাহার ফলে তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে এমন একটা দাম্ভিক ও কঠোর রূপ ফুটিয়া উঠিত যে, সে অঞ্চলের রূপসীরা রূপগর্ব্বে তাহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল; সকলে তাহাকে এজন্য হিংসা করিত। গর্ব্বিতা ও প্রভুত্বপরায়ণা চম্পক বাড়ির সকলকে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া শাসন করিত। বাড়ির লোকজন তাহাকে ভয় করিত, হয়তো ভিতরে ভিতরে অপছন্দও করিত, কেন না তাহার রুক্ষ মেজাজের পরিচয় পাইয়া সকলেই বুঝিয়াছিল যে, মুখের সৌন্দর্য্যের সহিত হৃদয়ের ঔদার্য্যের বড় বেশি সম্পর্ক নাই এবং ঠিক এই জন্যই জ্যেষ্ঠা হিসাবে সতীন তারার দাবি বেশি হওয়া উচিত হইলেও—সেই ছিল সংসারের সকলের কাছে আসল গৃহকর্ত্রী। মথুর ঘোষের স্বভাবে অবশ্য ভাল-বাসিবার বা ভালবাসা পাইবার মত কিছু ছিল না; এবং ইহাও নিশ্চয় যে প্রেম তাহার মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিও নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহ সকলের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে, তাই মথুরও তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর অনুরক্ত ছিল। মনের সুরুচি ও সুবুদ্ধি প্রণয়বৃত্তিকে আবেগময় ও স্বর্গীয় করিয়া

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরবশ মনে, ইহা কামলালসা অথবা নারী-মাধুর্য্যের অজানা রহস্যের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণেই শেষ হয়। কিন্তু হৃদয়-বৃত্তির প্রবলতা দুই ক্ষেত্রেই সমান তীক্ষ্ণ হইতে পারে। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে মথুর চম্পককে ভালবাসিত, ভালবাসা যদি নাও বলা চলে, সে চম্পকের প্রতি অধীর ও অন্ধ ভাবে অনুরক্ত ছিল।

চারিপাশের সকলের স্বার্থকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে লাগাইয়া কঠিন মনের শক্তিতে যে ব্যক্তি সকলের প্রভু হইয়াছিল, এই ছলনাময়ীর ইচ্ছাশক্তির কাছে সে ছিল একেবারে ক্রীতদাস। তারার স্বভাবে এমন মাধুর্য্য ও ধৈর্য্য ছিল যে তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধের কোন কারণ তাহার থাকিতে পারে না, কিন্তু তারা সম্বন্ধে মথুর উদাসীন ছিল, হয়তো সে ঔদাসীন্য এত বেশি যে তারার প্রতি সে কোনদিন দুর্ব্ব্যবহারও করিতে পারিত না।

রাজমোহনের স্ত্রী তাহাদের বাড়িতে আশ্রয় লইবে, ইহার অনুমতি স্বামীর নিকট হইতে পাইতে তারার বেগ পাইতে হয় নাই। উত্তরে মথুর বলিয়াছিল, দেবতা ও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমার বাড়িতে খাওয়া-পরার অসদ্ভাব নাই ; আর তুমি যখন বলছ, মেয়েটির স্বভাব ভাল, তখন যতদিন ইচ্ছা সে আমার এখানে থাকতে পারে। কিন্তু সরলমনা তারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে, কাজে ইহার প্রতিকূলাচরণ হইবে এবং তাহা তাহার এই সহৃদয়তাকে ব্যর্থ করিবে। চম্পক পছন্দ করে নাই যে, তাহার সতীনের আনুকূল্যে এ বাড়িতে বাহিরের কেহ আশ্রয় পায়।

মথুর ঘোষের অট্টালিকার উপর অস্তমান সূর্য্যের ম্লান কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে—মাতঙ্গিনীর ভাগ্যে যে দিন নানা অশুভ বিপদজালের সূচনা দেখা দিয়াছে, সে দিনখানি সন্ধ্যার দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তেতলার এক খোলা বারান্দার উপর তির্য্যকভাবে সূর্য্যকিরণ রহিয়া রহিয়া দেখা দিতেছে। শুধু বারান্দার উপর বসিয়া তারা তাহার মেয়ের খোঁপা

বাঁধিতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু সে বিনুনি মা কিংবা মেয়ে কাহারও পছন্দ-মাফিক হইতেছে না। মাতঙ্গিনী কাছেই বসিয়া 'হুঁ, হাঁ' করিয়া কতকগুলি অশিষ্ট ও বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। প্রশ্নকারিণী চম্পক—মুখরা এক নাপিতানীর সাহায্যে সে তাহার ছোট পা দুইটিতে আলতা পরিতে পরিতে মাতঙ্গিনীকে অনর্গল প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিল। কেমন করিয়া ইহা সে বুঝিবে যে, তাহার স্বামী যাহাকে কৃপাপরবশ হইয়া গৃহে আশ্রয় দিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে সে যাহাকে ঘরছাড়া করিতে পারে, সেই আশ্রিতা তাহার মুখের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে। মাতঙ্গিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে ও বিনীতভাবে উত্তর দিতেছিল, কিন্তু তাহাতে এই সুন্দরীর গর্ব্বে আঘাত লাগায় সে আরও চটিয়া উঠিতেছিল।

মাতঙ্গিনীকে আহ্বান করিয়া তারা বলিল, দেখছ, দুপুর বেলা থেকে চেষ্টা করেও এ মেয়ের খোঁপা কিছুতে বেঁধে উঠতে পারলাম না। তুমি বোধ হয় ভাল পার। যদি তুমি এই বিনুনিটা কি করে বাঁধি দেখিয়ে দাও, তবে কাজটা শেষ করতে পারি। মাতঙ্গিনী সেদিনকার জন্য খোঁপা বাঁধিবার অনুমতি চাহিল। বলিল, আমিও ভাল পারি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখি।

মেয়ের পিছনে বসিয়া মাতঙ্গিনী বিনুনি খুলিয়া নূতন করিয়া খোঁপা বাঁধিতে লাগিল। চম্পক বাধা দিয়া বলিল, আহা! দিদি বুঝি নিজেদের সেই পশ্চিমী খোঁপা বাঁধছ! যেমন ছিল তাই বরং ভাল।

মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, এ দেশের মত খোঁপা বাঁধতে আমি যদি পারি, তবে এই সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর দেখাবে।

চম্পক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, না বাপু না, এ খোঁপা বাঁধতে হবে না, নষ্টা স্ত্রীলোকেরা অমন খোঁপা বাঁধে। গেরস্তের মেয়ের এ খোঁপা ভাল মানাবে না।'

তারা বাধা দিয়া বলিল, ছিঃ! নষ্টা মেয়ে যদি সুন্দরী হয়, তবে সৌন্দর্য্যকে কি কেউ অবজ্ঞা করে নাকি! তুমি যা বলছ বোন, সেদিক দিয়ে হিসেব করলে, তোমার অমন সুন্দর মুখকেও কুশ্রী করে রাখা উচিত। না বাপু, নষ্টা মেয়েদের একমাথা চুল আছে বলে গেরস্থের মেয়ের তা থাকবে না, এ কেমনধারা কথা! যেমন করে খুশি তুমি খোঁপা বাঁধ দিদি।—মাতঙ্গিনীর উদ্দেশে সে বলিল।

চম্পক উত্তর দিল না বটে, কিন্তু তাহার মুখ যে রকম অন্ধকার হইয়া উঠিল তাহাতে ইহা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তারার মুখে তাহার প্রশংসাও সে নিজের খেয়ালে যে বাধা পাইয়াছে, তাহার জ্বালা ভুলাইতে পারে নাই। ঠিক এই সময়ে নীচের সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং মথুর ঘোষ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চম্পক চিবুক অবধি ঘোমটা টানিয়া ত্বরিতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল, দৌড়াইতে গিয়া তাহার পায়ের মল বাজিয়া উঠিল। তারাও অবশ্য মাথায় ঘোমটা টানিল, কিন্তু অতখানি নয়, এবং যাইবার জন্য আস্তে উঠিয়া বসিল। মাতঙ্গিনী সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মথুর ঘোষ দাঁড়াইয়া মেয়ের সহিত দুই-একটি কথা কহিল। দরজার আড়াল হইতে চম্পক তাহাকে লুকাইয়া লক্ষ্য করিতেছিল—সে সন্দিগ্ধ প্রকৃতির, সুতরাং তাহার নজর এড়াইল না যে, মেয়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে নবাগতার বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্ত্তির দিকেও স্বামীর সতৃষ্ণ দৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে। মথুর ঘোষ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেলে, মেয়েরা আবার নিজেদের কাজে আসিয়া বসিল। শুধু চম্পক বাদ রহিল। তাহার স্বামী গিয়া তাহাকে ঘরেই পাইল।

চম্পক বেশ জানিত যে, তাহার স্বামী তাহার কক্ষেই আসিবেন, তাহার নিজের দেখা করিবার দরকারও ছিল। কিন্তু পাছে কেহ বোঝে যে, তাহার সহিত দেখা করিতেই সে ঘরে আসিয়াছে, তাই স্বামীকে

বারান্দা হইতে এদিকে আসিতে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটি বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে পানের সহিত চিবাইবার জন্য কয়েকটি ভাল মসলা বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মথুর ঘোষ ঘরে আসিয়া দেখিল যে, মেঝেতে একরাশ রূপা, শিঙ ও কাঠের কৌটা এখানে ওখানে ছড়ানো। সে ঘরে ঢুকিয়াছে, ইহা তাহার স্ত্রী লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। তখনও তাহার মুখের কিয়দংশ ঘোমটায় ঢাকা ছিল, স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া সে দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফলের ছোট ছোট কৌটা মেঝের উপর ছড়াইয়াই চলিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মথুর বলিল, আবার কি হল! ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলে যেন মনে হচ্ছে।

চম্পক উত্তর না দিয়া কৌটার পর কৌটা মেঝের উপর সাজাইয়া চলিল।

মথুর বলিল, বুঝলাম। এখন বল তো আমার কোন্ অপরাধের এই দণ্ড?

কিন্তু তবু চাঁপা উত্তর দিল না। যেন যাহা খুঁজিতেছিল তাহা পাইয়াছে, এইভাব দেখাইয়া সে এবারে কৌটাগুলি গুছাইয়া বাক্সে তুলিয়া চাবি বন্ধ করিয়া উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য দোরের দিকে গেল।

মথুর তাহার হাত ধরিয়া সেদিকে যাইতে না দিয়া বলিল, তা হবে না প্রেয়সী, এই কুশ্রী ঘোমটারই বা এখানে কি প্রয়োজন? বলিয়া সে তাহার মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

চম্পক তাহার দিকে অত্যন্ত বিরক্তিভরা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, কেন আমার কাজে বাধা দিচ্ছ?

—বলই না, আমি কি করেছি যে আমার প্রতি এই বিরূপ দৃষ্টি!

চাঁপা শুধু বলিল, আমাকে ছাড়, যেতে দাও। যাইতে ইচ্ছা থাকিলে

সে অবশ্য অনায়াসেই যাইতে পারিত। কেন না তাহার স্বামী অত্যন্ত সোহাগে, সন্তর্পণে তাহার হাত ধরিয়াছিল—সে হাত ছাড়াইতে কাকুতির প্রয়োজন ছিল না—ছাড়, আমার কাজ আছে।

—কমলমুখীর বুঝি কাজ আছে! কি সে কাজ? মথুর হাসিয়া প্রশ্ন করিল।

রুক্ষ দৃষ্টি দিয়া সে উত্তরে বলিল, আমাকে পান সাজতে হবে।

মথুর বলিল এখানেই সাজ, আমাকেও দুই-একটি পান দিতে হবে।

সে আবার বলিল, ছাড় না, যেতে দাও।

মথুর অনুরাগভরে বলিল, কেন, কি হয়েছে? কি অপরাধ করেছি তা বল, এখনই তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

আদর কাড়াইয়া সে তেমন করিয়াই উত্তর দিল, আমার কাছে অপরাধ—আমার কাছে আবার তুমি কি অপরাধ করবে! আমি এমন কে যে তোমার অপরাধ নিতে পারি! না, তোমার যা খুশি তাই করতে পার—কে তোমার অপরাধ নেবে! আমি আবার একটা লোক! মথুর বলিল, সাবাস! এ যে ভয়ানক রাগ দেখি। এখন বল তো প্রাণেশ্বরী, আমাকে কি দুঃসাধ্য কাজ করতে হবে—আমি তা এখুনি করছি।

সে বলিল, যাও যে-বউকে ভালবাস তার কাছে, সেই বলবে তোমাকে কি অকাজ করতে হবে—তাই করো। আমি বেচারী লোক, তোমার বাড়িতে থাকা ছাড়া তোমার ঐশ্বর্য্যে আর কি ভাগ বসিয়েছি—আমার কথা তুমি কেন শুনবে! আর তোমার এবাড়িতে তো যে-সেই থাকতে পারে।

ব্যাপার কি বুঝিয়া মথুর বলিল, তাই নাকি? সে বলিতে যাইতেছিল—সতীনের কথায় ওই গরিব মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়াছি বলিয়াই এই রাগ! কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে থামিয়া গেল।

—তোমার বাড়ি, যাকে খুশি আশ্রয় দিতে পার। এখনও রাগ যেন যায় নাই এমনই ভাবে সে এই উত্তর দিল, কিন্তু তাহার বিরক্তির কারণ যে স্বামী এতক্ষণে বুঝিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে কতকটা খুশি হইয়াছিল।

এবার মথুর গম্ভীরভাবে বলিল, মেয়েলি রাগ রেখে সত্য করে বল তো এই অনাথা স্ত্রীলোটিকে কিছুকালের জন্যে আশ্রয় দিতে তোমার কি আপত্তি! চম্পক উত্তর দিল, অনাথা স্ত্রীলোক! কেন, অন্যায় করেছে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে তো দেবেই।

—কিন্তু সে যে অন্যায় করেছে, তা তুমি কি করে জানলে?

—কেন, তুমি কি ভাব যে মিছামিছি ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? নিজের স্ত্রীকে কেউ কখনও খেয়ালে পড়ে বাড়ি থেকে তাড়ায়?

—হাঁ, হতে পারে বটে সেই অন্যায় করেছে; কিন্তু তার স্বামীও অন্যায় করতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, বাড়িতে তাকে আশ্রয় দেওয়া কোনও ক্রমেই অন্যায় হতে পারে না।

আবার চম্পক বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, যা খুশি তা হলে কর—আমার মত চাও কেন?

—আবার! ছিঃ! মেয়েমানুষের প্রাণে আরও বেশি দয়া থাকা উচিত।

—যোগ্য হলে কে না দয়া দেখায়! ভালমন্দ সকলকেই কি দয়া করা উচিত?

—কিন্তু কে তোমাকে বলল যে ও সত্যিই দুরবস্থায় পড়ে নি! লোকে তো ওর স্বভাব ভাল বলেই জানে।

—লোকে বলে! চম্পক তাহার সুন্দর সুবৃহৎ নথের এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, সুকীর মায়ের বাজে বকুনি থেকে তুমি তো সব

সংবাদ পেয়েছ, ওর ওই মিথ্যে প্রমাণকে তুমি লোকজনের কথা বলে বিশ্বাস করছ কেন শুনি ?

মথুর একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন, তুমি কি ওর সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু কাউকেও বলতে শুনেছ ?

সে বলিল, পুরুষের চাইতে মেয়েদের কথা মেয়েরাই বেশি জানে।

মথুর আবার প্রশ্ন করিল, তুমি কি শুনেছ ?

এইবার একটু বক্রোক্তি করিয়া সে উত্তর দিল, মেয়েদের গোপন কথা শুনবার ব্যগ্রতা দেখাতে তোমার ভদ্রতায় বাধে না ?

মথুর ঘোষ বিরক্ত বোধ করিল। যে উদ্দেশ্যেই হউক মথুরের নিশ্চিত ইচ্ছা ছিল মাতঙ্গিনী তাহার আশ্রয়ে থাকিবে। এখন নিজের ইচ্ছামত সকল কাজ হউক যে ভাবে—স্ত্রীর কাছ হইতে এই অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ ব্যবহার পাইয়া সে বিরক্ত বোধ করিল।

কিছুকাল চিন্তা করিয়া সে বলিল, অন্তত তুমি এটা নিশ্চয়ই স্বীকার কর যে, আত্মীয় স্ত্রীলোককে বাড়ির বার করে দেওয়া অত্যন্ত খারাপ দেখায়। তুমি তো জান ও আমাদের আত্মীয়া—আমাদের ওপর ওর কি কোন দাবি নেই ?

—আর একজনের আত্মীয়তাসূত্রেই তো ও আমাদের আত্মীয়া !—উত্তর যেন প্রস্তুতই ছিল—বোনের বাড়িতে ও আশ্রয় নিল না কেন ? নিজের বোনের চেয়ে আমরা কি ওর বেশি আপন, না প্রিয়জন ? তারা ওকে ভাল করেই জানে বলে বোধ হয় সেখানে ও আশ্রয় নিতে যায় নি।

মথুর অত্যন্ত বিরক্তমনে কহিল, তুমি অত্যন্ত ছোটলোক। পৃথিবীতে যে নিরাশ্রয়, তারও বিরুদ্ধে তোমার রাগ ! আমার বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব আছে নাকি ?

অভিমান করিয়া চম্পক বলিল, না। সে যাই হোক্, ও যদি এ বাড়িতে

আশ্রয় পায়, আমি আমার অংশ ছেড়ে চলে যাব। দাও আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে, ও থাকুক এখানে। যে বাড়িতে ও রকম মেয়েমানুষ বাস করে নিজের মেয়ের সেখানে থাকা পছন্দ করার মত লোক আমার বাবা নন।

মথুর তিক্ত হইয়া বলিল, এসব আবার কি ?

—না, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। সে উত্তর দিল।

এইবারে মথুর নরম হইয়াছিল, বলিল, জান তো আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না ! এ ছেলেমানুষি রাখ।

উত্তর হইল, তা হলে ওকে তাড়াও।—ওকে তাড়াও, ও তোমার কে যে ওকে তাড়াতে বাধা হবে।

—আচ্ছা, একটু ভাববার সময় দাও।

এই কথা বলিয়া মথুর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মনে থাকিল, যত দিন স্ত্রীর মত না বদলায়, ততদিন তাহাকে কোনও প্রকারে ভুলাইয়া-ভালাইয়া ঠেকাইয়া রাখিবে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন পুনরায় এই ঘরে ফিরিল, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। ঘরের এক কোণে, তাহার শয্যা হইতে অনেক দূরে—অপর ঘর হইতে একটি সামান্য খাট আনাইয়া, তদুপরি আর একটি বিছানা পাতা হইয়াছে।

—এ কার জন্যে ? অতিরিক্ত শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়াতে মথুর জিজ্ঞাসা করিল। চম্পক কথা কহিল না, শুধু শয্যার উপর নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া কোন উত্তর না দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

স্ত্রৈণ মথুর ঘোষের সে রাত্রি কেমন কাটিল, তাহা আমাদের পাঠকবৃন্দ অনুমান করিবেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া বৈঠকখানায় গিয়া সে দেখিল, তাহার জন্য এক ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছে—রাজমোহন ঘোষ বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিল। সে মথুরকে তাহার আগমনোদ্দেশ্য

বুঝাইয়া বলিল। সে সংবাদ পাইয়াছে যে, তাহার স্ত্রী এখানে—সে মনোমালিন্যের ওজুহাতে বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া যাইবার সাহায্যার্থে অনুরোধ করিতে সে আসিয়াছে। মথুর স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিবার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না,—চম্পকের হাসি-মুখ দেখিবার ও সাংসারিক শান্তির ইচ্ছা তো ছিলই আরো অন্যান্য অনেক দিক বিচার করিয়া ইহা ছাড়া অপর কোন পন্থাও সে দেখিতে পাইল না।

যখন মাতঙ্গিনীকে সংবাদ দেওয়া হইল তাহাকে যাইতে হইবে, নিজের ভাগ্যে যাহা ঘটিবে সে কথা ভাবিয়া তাহার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। প্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় সে স্বকীর মায়ের পিছনে পিছনে চলিল, তাহাকে বাড়িতে রাখিয়া আসিবার ভার স্বকীর মায়ের উপর পড়িয়াছিল। তারা খিড়কির দোর অবধি তাহাকে আগাইয়া দিল, এবং সম্ভব হইলে আরও খানিক আগাইয়া দিত। তাহাকে সে ভারী-মনে বিদায় দিল এবং স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ভুলিয়া সুখে শান্তিতে থাকিবার কথা সে মাতঙ্গিনীকে বার বার করিয়া বলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ ও মন্ত্রণা

মধুমতীর বন্য অথচ সুদৃশ্য দুই তীর, নিকটে জনাকীর্ণ গ্রামের অবস্থান সত্ত্বেও, সুদীর্ঘ দুর্ভেদ্য তৃণে আচ্ছন্ন, এবং এই তৃণভূমি মনুষ্যপদলাঞ্ছিত নহে। রাধাগঞ্জের ঈষৎ দক্ষিণে এইরূপ একটি অদ্ভুত-নির্জ্জনতা-হেতু প্রায় ভয়াবহ স্থান আছে। নিবিড় তৃণভূমিই শুধু স্থানটিকে সুদুর্গম করিয়া রাখে নাই, ঘনসন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ বেতসলতা ও অন্যান্য লতাগুল্ম ইহাকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছে। নদীতীর হইতে ভিতরে বহুদূর

পর্য্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত। এমন কোনও একটি স্থান যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হইত, যেখান হইতে লতাগুল্মাচ্ছাদিত সুদূরপ্রসারী এই বনভূমিকে একটি সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান আলেখ্যের মত দেখিবার পথে কোনও অন্তরায় উপস্থিত না হইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে, ঘনসন্নিবিষ্ট এই বনভূমির কোথাও একটু ফাঁক নাই। বিষধর সর্পের এই অন্ধকার আবাসভূমিও যে মনুষ্যপদশব্দে চকিত হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণস্বরূপ এক অতি সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলার পথ আছে; কিন্তু এই পায়ে-চলার-পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে গভীর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োজন। এই পদচিহ্ন ধরিয়া সামান্য অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া যায়; অরণ্যের তৃণ ও অন্ধকার নিঃশেষে পথের সকল চিহ্ন গ্রাস করে। এই পথে চলিতে অভ্যস্ত যাহারা, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; এই চিহ্নহীন আঁকাবাঁকা পথেই তাহাদের অভ্যস্ত চক্ষু তাহাদিগকে অভ্যন্তরে লইয়া যায়, বনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তৃণ-কুটীরটি পয্যন্ত। কুটীরের চালটি আশপাশের ঝোপগুলি হইতে একটু উচ্চ হইলেও সন্নিহিত বৃক্ষের শাখা-পত্র কৌশলে টানিয়া ও সাজাইয়া এমনভাবে চালটিকে গোপন করা হইয়াছে যে কাহারও কৌতূহলী দৃষ্টি সেদিকে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না; সমস্তটা মিলিয়া কুটীরটিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটা ঝোপ বলিয়াই মনে হইত। এই ক্ষুদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই মনে কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব জাগে, নিরানন্দে মন ভরিয়া উঠে। কুটীরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে। বাঁশ এবং দরমা নির্ম্মিত দেওয়াল, ভিজা মেঝেতেও দুই-তিন পুরু দরমা বিস্তৃত; এক কোণে মৃত্তিকানির্ম্মিত ধূম্রকৃষ্ণ রন্ধনের কয়েকটি পাত্র জড়ো করা ছিল; দেখিলেই মনে হয় যে, এগুলি কচিৎ ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যুষ তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই; ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপত্রের অন্তরাল-পথে প্রাতঃসূর্য্যের সুদীর্ঘ রশ্মি তখনও বনভূমিতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

কুটীরের অধিবাসী দুইজন মাত্র ব্যক্তি, তাহাদের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ; দেহের অবয়ব ও গঠন এমন সুদৃঢ় এবং পেশীবহুল যে দৃষ্টিমাত্র তাহাদের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের কটিদেশে মাত্র একখণ্ড করিয়া সামান্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট স্থূল বস্ত্র জড়ানো ছিল। সুকৃষ্ণ দেহের অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত লাঠি ও তরবারিগুলি দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে, নিতান্ত শান্তিতে তাহারা জীবিকার্জ্জন করে না। তীব্রগন্ধী গঞ্জিকার ধূমে কুটীরটি পরিপূর্ণ, তাহারা পালা করিয়া গাঁজা টানিতেছিল। সেই জনমানবশূন্য বন-প্রদেশেও তাহারা অত্যন্ত সাবধানে অতি নিম্নকণ্ঠে কথোপকথনে নিরত ছিল।

একজন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আমাদের এতে লাভ?—কণ্ঠস্বরে পাঠক নিশ্চয়ই পূর্ব্বপরিচিত ভিখুকে চিনিতে পারিতেছেন।

তাহার সঙ্গী উত্তর দিল, একটা মোটা টাকা। পাঠক বুঝিতেছেন ইনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব সর্দ্দার ছাড়া আর কেহই নন।—পাক্কা পাঁচটি হাজার টাকা। এক রাত্রের রোজগার হিসেবে মন্দ নয়। কি বল? ভাগীদার তো আর কেউ জুটছে না।

ভিখু উল্লাস গোপন করিতে পারিল না, চেঁচাইয়া উঠিল, তোফা। ভাটার মত তাহার গোল চোখ দুইটি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।—তা হ'লে উকিল ব্যাটাকে রাস্তায় সাবড়ে দিয়ে দলিলটা হাত করলেই তো হয়! তার সঙ্গেই তো ওটা থাকবে! অন্য জায়গা থেকে ওটা সরানো কি সুবিধে হবে?

সর্দ্দার উত্তর দিল, যত গোল বাধিয়েছে তো ওই মাগী, ওই রাজমোহনের স্ত্রী! রাজমোহনের সঙ্গে আমার পরামর্শ বেটী সব শুনেছে—আমরা যে দলিলটার সন্ধানে আছি মাধবের তা জানতে বাকি নেই। সে কি আর রীতিমত সেপাই-শাস্ত্রী না দিয়ে দলিল পাঠাবে? আমরা

তো এদিকে সাকুল্যে দুজন। অন্য রাস্তায় দলিল হাতাবার চেষ্টা কেন করছি, বুঝলি তো বাঁদর!

ভিখু উত্তর দিল, সর্দ্দার, তাই বা হবে কেমন ক'রে শুনি। দুজন মিলে বাড়ি চড়াও ক'রে কোনও কাজ হবে ?

সর্দ্দার বলিল, সে কাজ আমি করব রে উল্লুক, গায়ের জোরে যেখানে কাজ না হয় সেখানে বুদ্ধিতে কাজ হাসিল করতে হয়।

ভিখু ছিলিমে একটা লম্বা টান মারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল, গাঁজার ধূমকুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উপরে উঠিতেছে।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সে বলিয়া উঠিল, না, না সর্দ্দার, আমি তো ভেবেই ঠিক করতে পারছি না, তুমি কেমন ক'রে কাজ হাসিল করবে। আর একটা কথা, যার জন্যে এই কাজ করতে হবে, সে কি পাঁচ হাজারের এক হাজারও আগাম দেবে না ? ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল! টাকাটা হাতে এলে তো বুঝি কিছু কাজ হ'ল। তখন এখান থেকে কেটে পড়লেই বা আমাদের ধরছে কে ?

একটু গম্ভীর হইয়া সর্দ্দার উত্তর করিল, আরে বাবা, সে কি তেমন কাঁচা ছেলে! আমার সঙ্গে তার বন্দোবস্তটা কেমন হয়েছে শোন্। দলিলটা আমাদের হাতে এসেছে দেখাতে পারলে তবেই সে দেবে এক হাজার, তার হাতে সেটা দিলে আর দু হাজার, তা' হলে মোট তিন হাজার হ'ল। তারপর মকদ্দমা হ'লে যদি তার জিত হয় তা হ'লে বাকি দু হাজার আমরা পাব। তবে উইলটা নষ্ট ক'রে দিলে জিত যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

—তা হ'লে উপায় ? কি মতলব করছ শুনি ?

—না রে না। তুই বেটা আগে থাকতে শুনলেই সব কাজ পণ্ড করবি। ধূর্ত্ত রাজমোহন তোর পেট থেকে কথা টেনে বের করবে,

তা হ'লেই সব মাটি। ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্, যা বলি কর্—বাস্, কাজ ঠিক হবেই।

ভিখু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, কি, রাজমোহন আমাকে ঠকাবে?—কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর নামাইয়া সে বলিয়া উঠিল, চুপ, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

অদূরে বনের মধ্য হইতে পেঁচা যেমন শব্দ করে মনুষ্যকণ্ঠে তাহার অনুকৃতি শোনা গেল। সর্দ্দার ঠিক অনুরূপ শব্দ করিয়া উত্তর দিয়া বলিল, রাজমোহন আসছে।

দেখিতে না দেখিতে রাজমোহন সশরীরে কুটীরে দর্শন দিল। সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, এই যে রাজমোহন, খবর কি?

রাজমোহন বলিল, খবর ভাল, আমার স্ত্রী ফিরে এসেছে।

সর্দ্দার খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল, বটে, বটে? কেমন করে পেলে হে? সে ছিল কোথায়?

রাজমোহন বলিল, সেও এক তাজ্জব ব্যাপার! বোনের বাড়ি সে যায় নি। আন্দাজ করতে পার কোথায় গিয়েছিল সে?

দস্যু দুইজনেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, কোথায়? কোথায়?

—আরে আমি কিন্তু ঠিকই আঁচ করেছিলাম—গিয়েছিলেন খোদ মথুর ঘোষের বাড়িতে।

—বটে! তা সে ফিরে এসে বলছে কি?

—কি আর বলবে? এখন পর্য্যন্ত তো একটা কথাও বের করতে পারি নি। বাড়িতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, তারা কেউ কিছু জেনেছে ব'লে তো মনে হ'ল না।

সর্দ্দার চাপা কণ্ঠে বলিল, যা হোক, ওকে খতম ক'রে দাও।—তাহার রোষকষায়িত চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতেছিল বলিয়া মনোভাব গোপন করিবার জন্য সে দৃষ্টি নত করিল।

রাজমোহন বলিল, ভেবে দেখ সর্দ্দার, তার কি কোনও দরকার আছে ?

—আহা, আমি আগেই বলেছিলাম তুমি—

রাজমোহন কথায় একটু জোর দিয়া বলিল, শোন সর্দ্দার, সবটা শোনই না। ওই বদমাস মাগীকে আমি তোমাদের চাইতে কম ঘৃণা করি না। সেদিন সকালে যদি ওকে পেতাম, তা হ'লে দেখতেই পেতে, ওর ওপর আমার কত ভালবাসা ! এখন আমি স্বীকার করছি, রক্তটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ও কাজ করার মত সাহসও এখন নেই, অতটা কঠোরও হতে পারছি না। তা ছাড়া আমরা যে জন্যে ভয় পেয়েছিলাম, সে কাজ সে করে নি ; সে মাধব ঘোষের বাড়িতেও যায় নি, কালকের রাত্রের ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করে নি। যদি আজ এসব ও না করে থাকে, কালই যে করবে তার মানে কি ?

সর্দ্দার একটু ভাবিল, শেষে বলিল, বেশ, আমি এমন একটা জায়গার কথা জানি, যেখানে ওকে পাঠালে তোমার আমার কারও আপত্তি হবে না, বিপদের আশঙ্কাও কিছু থাকবে না।

রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

—জিনিস-পত্তর বেঁধে ছেঁদে তোমার সুন্দরী পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে মিৎগুন্টিতে বসবাস করবে।

—ডাকাত হয়ে থাকতে হবে নাকি ?

—ডাকাত তুমি নও ?

—কাজে হয়তো তাই, কিন্তু নামডাকে ডাকাত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

—তা হ'লে তুমি যাবে না ?

—না, এই নচ্ছার স্ত্রী ছাড়াও আমার সংসারে অন্য লোক আছে। তাদের সবাইকে নিয়ে কি ডাকাত হওয়া সম্ভব ?

—আমাদের সংসার নেই নাকি ?

—আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমি তো এদের জানাতে পারব না ত কি ভাবে আমি জীবন নির্ব্বাহ করব।

সর্দ্দার তাহাকে বাধা দিয়া প্রভুত্বের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, চোপ। আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার বোনকে ছেলেপিলে সমেত তার স্বামীর কাছে পাঠাতে পার, সে গরিব কি বড়লোক তা তোমার দেখার দরকার কি ? আর তোমার পিসী—তোমার মত অনেকেরই পিসী সে ; নিজের পথ সে নিজেই দেখে নিতে পারবে।

রাজমোহনের দ্বিধা তখনও দূর হয় নাই। অনেকক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষে সর্দ্দারের হুমকি এবং মাধব ঘোষের জমিদারি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগের বাসনায় সর্দ্দারের প্রস্তাবে সে রাজী হইল।

তখনও দুপুর শেষ হয় নাই—রাজমোহন স্নান সারিয়া প্রাতরাশ গ্রহণের জন্য বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমেই দেখা হইল তাহার বোন কিশোরীর সঙ্গে।

রাজমোহন বলিল, কিশোরী, সেই হতভাগীকে আমার কাছে আসতে বল্। আমার বাড়ি ছেড়ে আবার কেমন ক'রে পালাতে হবে তাই তাকে শিখিয়ে দেব। যা।

কিশোরী অবাক হইয়া বলিল, কার কথা বলছ দাদা ?

কিশোরীর প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া রাজমোহন দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, কার কথা বলছি ? কেন, তোর বউদির কথা ! তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি ?

কিশোরী বলিল, বউদি তো বাড়িতে নেই।

রাজমোহন চমকাইয়া উঠিল, বলিল, বাড়িতে নেই, তার মানে ? সকালে কি সে ফেরে নি ?

—তুমি বলছিলে বটে যে বড়বাড়ি থেকে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। তুমি কি পাঠিয়েছিলে তাকে ?

বিরক্তি ও বিস্ময়ে রাজমোহন কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, সব জোচ্চুরি, আমি নিজে দেখেছি সুকীর মায়ের সঙ্গে সে এদিকে আসছিল।

কিশোরী বলিল, অবাক কাণ্ড বাপু, তবে গেল কোথায় ? সবাইকে জিজ্ঞেস কর, কেউ দেখেছে কি না !

রাজমোহন বাঘের মত ছুটিয়া বাড়ির আশপাশ চারিদিকটা একবার দেখিয়া আসিল ; তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মাতঙ্গিনীকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, দৌড়ে যা কিশোরী, দেখে আয়, হতভাগী নিশ্চয়ই আবার তার বোনের আশ্রয় নিয়েছে। দাঁড়া, পিসিমাকে বল্, কনকদের বাড়িতে খোঁজ করতে। সেখানেও সে যেতে পারে। আমি এখানে পাহারায় থাকছি।

কিশোরী আর তাহার পিসি দুইজনে দুইদিকে ছুটিয়া গেল কিন্তু অনতিবিলম্বে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাগে বিরক্তিতে ও বিস্ময়ে হতভাগ্য রাজমোহন গজরাইতে লাগিল। সেই দুপুরের রৌদ্রেই সে কিশোরীকে আবার মথুর ঘোষের বাড়িতে খবর লইতে পাঠাইল। কিশোরীর পক্ষে অতদূর যাওয়াটা খুব সহজসাধ্য ছিল না, তবুও কিশোরী বিনীতভাবে দাদার আদেশ প্রতিপালন করিল, কিন্তু তাহার বউদিদির কোনও সন্ধানই লইয়া আসিতে পারিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমাদের নায়কের ভাগ্যে কি ঘটিল

পূর্ব্বপরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকার। মাধবের কক্ষের উজ্জ্বল কম্পমান আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইতেছিল; বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আলোর এই প্রাচুর্য্য অসাম্যতায় অপরূপ দেখাইতেছিল। মাধব একা ছিল, সাটিনবস্ত্রাচ্ছাদিত একটি মেহগনি কৌচে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় সে বসিয়া ছিল। কক্ষে একটি মাত্র আলো সমুজ্জ্বল। কৌচের উপর দুই-তিনটি ইংরেজী পুস্তক বিক্ষিপ্ত, তাহারই একটি মাধবের হস্তধৃত ছিল, কিন্তু সে তাহা পাঠ করিতেছিল এমন বোধ হইতেছিল না। উন্মুক্ত বাতায়নপথে তারকাখচিত অন্ধকার আকাশের যতটুকু দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, মাধব সেই দিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উপবিষ্ট ছিল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল। মকদ্দমার ফলাফল সম্বন্ধে তাহার মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছিল; তাহার ধূর্ত্ত এবং কৌশলী প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে-সকল বিবেকবিচারশূন্য ব্যক্তিদের তাহার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা করিতে পারে না এমন পাপ নাই; তাহাদেরই অস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের সহিত যুঝিয়া উঠার ইচ্ছা ও সামর্থ্য মাধবের ছিল না। যদি তাহারা সফলকাম হয় মাধবের ভবিষ্যৎ যে কি হইবে, কে জানে? মাতঙ্গিনীর কপালেই না জানি কি আছে—তাহার ভাগ্যদেবতা যে সুগম পথে তাহাকে লইয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত। মথুর ঘোষের গৃহে আশ্রয় লওয়া, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সহসা তাহার অন্তর্দ্ধান হওয়ার সংবাদ সে পাইয়াছিল।

কি কারণে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির আশ্রয় লইতে সে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা মাধব অবগত ছিল না। গুজব যে কিছু না শুনিয়াছিল তাহা নয়, তবে মাতঙ্গিনীকে সে এত ভাল করিয়া জানিত যে, সামান্য কোনও কারণে যে, এই সাহসী যুবতী এই উপায় অবলম্বন করে নাই ইহা নিশ্চিত ; মাতঙ্গিনী সহসা রমণী ও পত্নী সুলভ ধৈর্য্য হারাইয়া নিজের দুঃখ ডাকিয়া আনিবার পাত্রী নয়। আশ্রয় ও সাহায্যের প্রয়োজন সত্ত্বেও সে যে কেন ভগিনীর শরণাপন্ন হয় নাই, মাধব তাহা ভাল রকমেই জানিত এবং মনে মনে এই কার্য্যের প্রশংসা করিত। কিন্তু তাহার গৃহত্যাগ করিবার কি হেতু ঘটিতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। সহসা অদ্ভুতভাবে অন্তর্দ্ধান ব্যাপারটা তাহার কাছে অধিকতর বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল। মাতঙ্গিনী যে তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে ডাকাতদের মন্ত্রণার কথা জানিতে পারিয়া তাহারা কাজ হাসিল করিবার পূর্ব্বেই যথাসময়ে তাহাকে তাহা জ্ঞাপন করাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়াছিল—এই কথা ভাবিয়া মাতঙ্গিনীর ভাগ্য সম্বন্ধে সহস্র দুশ্চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতেছিল ; এক-একবার সে এক-একরকম ভাবে, পরক্ষণেই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব জ্ঞানে সে চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিল বলিয়াই এক বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হইল যে, মাতঙ্গিনীর দুর্ভাগ্য যে রূপ লইয়াই আসুক, কোনও পাপ উদ্দেশ্য লইয়া সে পতিগৃহ ত্যাগ করে নাই। বিপদ যে তাহার একটা কিছু ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধেও তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না, তাই সে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছিল। মাতঙ্গিনী সম্বন্ধে তাহার মনে যে গভীর অথচ মধুর ভাব স্বতই জাগিতেছিল, বহুকষ্টে দমন করিতে হইতেছিল বলিয়া বহ্নির মত তাহা তাহার বুকে জ্বলিতে লাগিল। সেই বিদায়-দৃশ্যের স্মৃতি তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, মাতঙ্গিনীর প্রত্যেকটি কথা স্মরণে উদিত হইয়া তাহার চক্ষু অশ্রুসজল

হইয়া উঠিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিল। পরে আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শে দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানেও দুশ্চিন্তা তাহাকে পরিহার করিল না। রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া করতলের উপর মাথা রাখিয়া সেই নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং দূর সুনীল চন্দ্রাতপের গায়ে গাঢ় কালো ছায়ায় সজ্জিত দীর্ঘ দেবদারু-গাছের সারির দিকে অপলক চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার সে সেই বিপদ-সাগরে ডুবিয়া গেল। নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা তাহার দৃষ্টি একটা অদ্ভুত বস্তুতে আকৃষ্ট হইল। আকাশের পটভূমিতে একটি দেবদারুকাণ্ডোত্থিত শাখা যেখানে গাঢ় কালো ছায়ার মত কিছুকাল তাহার দৃষ্টিপথে ছিল, হঠাৎ মনে হইল সেই ছায়া যেন মিলাইয়া গেল। মানুষের মনের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, যখন সে নিজের দুশ্চিন্তায় গভীরভাবে ডুবিয়া থাকে, এক-একটা অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও মাঝে মাঝে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাছের গুঁড়িসংলগ্ন এই কালো ছায়ার হঠাৎ অপসরণ মাধবের কাছে বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল। তাহার যে ভুল হয় নাই ইহা স্থির, কোনও কর্ত্তিত শাখার শেষাংশ অথবা গ্রন্থিবহুল কাণ্ডের বিস্তার, যাহাই হউক, বস্তুটি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তথাপি সেই মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করিয়া নিজের চিন্তায় ব্যস্ত মাধব হৃদয়ের খুব সমীপবর্ত্তী বস্তু লইয়াই আবার ভাবিতে বসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই মাধব আবার পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষকাণ্ডের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, অন্তর্হিত ছায়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়াছে। এইবার সামান্য কৌতূহলের উদ্রেক হওয়াতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিনিবেশসহকারে কিছুক্ষণ ধরিয়া স্থানটি লক্ষ্য করিতে লাগিল। আবার হঠাৎ বস্তুটি সরিয়া গেল। স্পষ্ট বুঝা গেল উহা গতিশীল। সে ভাবিল, ব্যাপারখানা কি? প্রথমে

মনে হইল, পেঁচা কিংবা ওই জাতীয় নিশাচর পাখী হইবে; অন্ধকার এবং দূর বলিয়া শাখার উপর নিদ্রিত প্রাণীটিকে দেখা যাইতেছে না। ছায়াটি আবার দেখা গেল। মাধব এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও বাদুড় অথবা অন্য কোনও পাখীর আকৃতির সহিত ছায়াটির সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইল না। বরঞ্চ মানুষের মাথার সহিত উহার যেন অনেকটা মিল আছে। আকাশের গায়ে ছায়া স্পষ্ট হইল; মাধবের মনে হইল, গাছের গুঁড়ির অন্তরালে যেন গলার খানিকটাও সে দেখিতে পাইল। অবশ্য এমন উচ্চে ছায়াটি পরিলক্ষিত হইল, যেখানে সচরাচর মানুষ উঠে না। বার বার ছায়ার আবির্ভাব ও তিরোভাবে মাধবের কৌতূহল অথবা আশঙ্কা অথবা উভয়ই এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, সে কাছে গিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিল। মাধব প্রথম ভাবের ধাক্কাতেই কাজে নামিয়া যায়; এক্ষেত্রেও পরীক্ষার কথাটা মনে উদিত হওয়া মাত্রই সে নিজে গিয়া গাছের আড়ালে কেহ আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে স্থির করিল। বৈঠকখানায় যে ক্ষুদ্র রৌপ্যমণ্ডিত তরবারি ঝুলিতেছিল, তাহা লইয়া নিজেকে সশস্ত্র করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। পুনরায় সে সদর দেউড়ি হইতে গাছটির দিকে ভাল করিয়া চাহিল; দেউড়ি হইতে দেবদারু সারির দূরত্ব বেশি নয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্টস্থানে সে কিছুই দেখিতে পাইল না। এদিক ওদিক সন্ধান করিয়াও খোঁজ পাওয়া গেল না। সুতরাং গাছের গোড়া পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হইল। কিন্তু সেখান পৌছিতে না পৌছিতেই পেঁচার কর্কশ চীৎকারের মত একটা শব্দ তাহাকে চমকাইয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে কঠিন একটা আঘাতে তাহার হাত হইতে কে যেন তরবারিটি কাড়িয়া লইল। এই হঠাৎ আক্রমণকারী কে, বা কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই একটা বলিষ্ঠ হাতের বৃহৎ এবং কর্কশ থাবা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুলকায় একটি লোক গাছ হইতে মাটিতে লাফাইয়া

পড়িল। মাধব ঘোষ তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি ভীষণদর্শন পুরুষকে দেখিতে পাইল। তাহার দেহ তেজোব্যঞ্জক এবং সে সশস্ত্র ছিল।

মাধবের অস্ত্র যে ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিতে অপর ব্যক্তি অতি মৃদুস্বরে বলিল, বেঁধে ফেল্, বেঁধে ফেল্; মেঘ না চাইতেই দেখছি জল। আগে ওর মুখ বন্ধ কর্।

অন্য ব্যক্তি ততক্ষণে একটা গামছা ও খানিকটা দড়ি তাহার কোমর হইতে বাহির করিয়া গামছা মুখে পুরিয়া মাধবের কণ্ঠরোধ করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিতে লাগিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি মাধবকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। মাধব দেখিল, ধস্তাধস্তি করিয়া কোনও লাভ নাই, চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই, চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করাও অসম্ভব; সে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করিল।

পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে পুনরায় হুকুম হইল, একে পাঁজাকোলা ক'রে ধ'রে নিয়ে চল্।

বন্ধনকারী মাধবকে তাহার বিরাট বাহুর সাহায্যে শূন্যে তুলিল এবং প্রায় অবলীলাক্রমে সেই হতভাগ্য যুবককে লইয়া চলিল। অন্যজন তাহারা অনুসরণ করিল। তাহারা এমন নিঃশব্দে ও তৎপরতার সহিত কার্য্য সমাধা করিল যে, বাড়ির কেহই এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সতর্ক প্রেম

আমাদের উপন্যাসের নায়কের ভাগ্যে সহসা এরূপ বিপর্যায় যখন ঘটিল, (পাঠক, নিশ্চয়ই মাধবকেই এই উপন্যাসের নায়ক বলিয়া বুঝিয়াছেন।) মথুর ঘোষ তখন বিশ্রামসুখমগ্ন, অথবা আরও যথাযথ বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়, সে তারার কক্ষে বিশ্রাম করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। তাহার অৰ্দ্ধশায়িত দেহের সন্নিকটে কৌচের উপরই বসিয়া বসিয়া তারা হাতের ক্ষুদ্র সূক্ষ্মকারুকার্য্যমণ্ডিত খস্‌খস্‌নির্ম্মিত পাখার সাহায্যে স্বামীর ক্ষুব্ধ আত্মাকে সস্নেহে ও পরম ধৈর্য্যের সহিত ঘুম পাড়াইতে চেষ্টিত ছিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতেছিল না, কারণ যদিচ মথুর ঘোষ নীরব ও মুদিতনেত্র অবস্থায় ছিল, ক্ষণে ক্ষণে তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া তাহার মনের আশঙ্কা-ব্যগ্রতার পরিচয় দিতেছিল ; স্বামীর এই ব্যাকুলতার কারণ তারার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তারাই কথা কহিল।

তারা বলিল, তুমি যে ঘুমোচ্ছ না !

—ঘুম আস্‌ছে না, ঘুমের সময় তো আমার ঠিক এটা নয়।

—তবে ঘুমুতে এলে কেন ? দেখ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, আমার আস্পর্দ্ধা ভেবে তুমি যদি রাগ না কর তো বলি।

—কিছু বলবার থাকে তো বলই না !

—তোমার মনে সুখ নেই ; যে তোমাকে সত্যিই ভালবাসে, তারও কাছে কি তার কারণ বলতে বাধা আছে ?

মথুর চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিবার জন্য হাসিবার ভঙ্গীতে জবাব দিল বটে,

কিন্তু তারার স্নেহ-দৃষ্টির কাছে তাহার এই প্রয়াস ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না। মথুর বলিল, পাগল! যত আজগুবি কথা! আমার আবার দুঃখ হবে কেন?

তারা ব্যগ্র অথচ স্নেহপূর্ণস্বরে বাধা দিয়া বলিল, প্রিয়তম, আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্ট ক'রো না। আমি জানি তুমি আমাকে আর আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা কর। আমরা মেয়েমানুষ, স্বামী যে আমাদের কি— আমি জানি না, স্বামী আমাদের কি নয়! তুমি সারা সংসারকে ফাঁকি দিতে পারবে, কিন্তু আমাকে পারবে না।

মথুর বলিল, তুমি পাগল না হ'লে আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে না।—তাহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, যাহা তাহার নিজের কথারই প্রতিবাদ করিতেছিল।—এসব ভাবার কারণটাই খুলে বল।

তারা বলিল, এর কারণ তুমি নিজে। শোন। জানি, অনেক বিষয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হয়; তোমার তালুক, তোমার মামলা-মকদ্দমা, তোমার খাজনা, তোমার কাছারি, তোমার বাড়ি, বাগান, দাসদাসী, তোমার সংসার—অনেক কিছু নিয়েই তোমাকে ভাবতে হয়; আমার কি আছে? আমার স্বামী আর আমার মেয়ে। আমি যদি বলি, গত তিন দিন ধ'রে আমি লক্ষ্য করছি আমার স্বামীর চলার ভঙ্গীতে পূর্ব্বেকার সেই তেজ আর গর্ব্বের অভাব হয়েছে, তাতে অবাক হবার কি আছে? তোমার চোখে শূন্য দৃষ্টি, মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত ভাবে তুমি চেয়ে থাক। তুমি আগের চাইতে কথা কম বল, তোমার হাসি তোমার অন্তরের হাসি নয়। দেখ, মায়ের চোখ এটা লক্ষ্য করতে কখনও ভুল করে না যে, তার সন্তানকে তার বাবা আগের মত তেমন আদরের সঙ্গে বুকে নেয় না! হ্যাঁ, গত তিন দিন ধ'রেই আমি দেখছি, বিন্দু যখনই তোমার হাত ধরেছে কিংবা তোমার কাছে ব'সে খেলা করেছে, তুমি তার সঙ্গে কথা বল নি। চাঁপার সঙ্গেও তো কই তোমাকে কথা বলতে দেখি না।

সতীনের কথা বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য তারার ব্যগ্র মুখভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল; একটা কুটিল হাসি তাহার মুখে খেলিয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তারা বলিতে লাগিল, চাঁপাও দেখছি এ ক'দিন খুব দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে, তবু তুমি ভদ্রভাবে তার কোনও কথাই শুনছ না। আর তোমার এই দীর্ঘনিঃশ্বাস! তুমি কি এখনও বলতে চাও, তোমার কিছু হয় নি?

মথুর উত্তর দিল না।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া তারা আবার বলিতে লাগিল, তুমি কি আমাকে তোমার দুঃখের অংশভাগী হওয়ার উপযুক্ত মনে কর না? আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস না।

তারা স্বামীর উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ চুপ করিল। মথুর তখনও নিরুত্তর। প্রেমময়ী পত্নীর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বসিয়া রহিল; তাহার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

তারা আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমার মনে কোনও সুখ নেই, তুমি আমার কাছে গোপন ক'রো না, ফাঁকি দিও না আমাকে—গভীর যন্ত্রণায় তাহার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল—আর ঠকিও না আমাকে, কিছু লুকিও না আমার কাছে, সব খুলে বল। আমার জীবন দিয়েও যদি তোমার মনের সুখ ফিরিয়ে আনতে পারি আমি তাই ক'রব—তুমি সুখী হও।

মথুর তবুও নির্ব্বাক হইয়া রহিল। উপহাস, তর্ক বা অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। একটা কঠোর গাম্ভীর্য্যের আবরণে সে বসিয়া রহিল এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার মুখভাগে যে প্রাণহীনতা ও কপটতা আনিয়া সে তাহার পত্নীর প্রশ্নধারা এড়াইয়া চলিতেছিল, তাহা দূর হইয়া তাহার মুখে সত্যকার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল; এই ব্যাকুলতা তাহার

প্রতি দর্শকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিলেও কোথায় যেন একটা বাধা ঘটাইতেছিল। তারার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রমণী-সুলভ হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা সে স্বামীর মুখভাবের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল।

ব্যথিত পত্নী বলিয়া উঠিল, কি কুক্ষণেই না আমি জন্মেছিলাম! এখনও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি হয় নি! তোমাকে যদি প্রাণ দিয়েও সুখী করতে পারি, তাও আমি করব! কি শুভক্ষণেই না জানি জন্মেছিলাম! তোমার দুঃখের কারণটাও আমি জানতে পাব না?

স্ত্রীর ক্রন্দন মথুরের হৃদয় স্পর্শ করিল। অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গীতে সে অবশেষে বলিল, আমার দুশ্চিন্তার কারণ তোমার কাছ থেকে গোপন রেখে লাভ নেই, তারা। তোমার কাছেও আমি কিছু খুলে বলতে ভরসা করছি না—তুমি সে জন্য দুঃখ ক'রো না। তোমার শোনার উপযুক্ত কথা সে নয়।

স্বামীর এই কথা শুনিয়া তাহার ম্লান অথচ মহিমান্বিত মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্ত কালের জন্য গভীর যন্ত্রণার রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে শান্ত সহজভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, তা হ'লে আমার একটা সামান্য অনুরোধ রাখবে বল, আমাকে কথা দাও।

কিন্তু তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অদূরে পেঁচার চীৎকারের মত এক বিকট কর্কশ-হুঙ্কার শোনা গেল। সেই শব্দ শুনিয়া মথুর চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারা জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ গো, তুমি চমকালে কেন? শব্দটা শুনে আমার বড্ড ভয় হ'ল বটে, কিন্তু ও তো প্যাঁচার ডাক।

আরও কর্কশ আরও ভীষণভাবে সেই শব্দ আবার বাতাসে ভাসিয়া আসিল। তারা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মথুর বেগে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তারা বিস্মিত হইল। শব্দটা যে পেঁচার চীৎকার সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল না—পেঁচার ডাক না হইলেও তাহা এমন কিছু ভয়াবহ নয়। অন্তত তাহার মনে হইল যে, এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা ছাড়া উহাতে ভয়ের বিশেষ কিছু নাই—এই অমঙ্গল-ধ্বনি লোকে তো প্রত্যহ শোনে এবং সহ্য করে। তাহার একবার শুধু মনে হইল আওয়াজটা যেন নিশাচর পাখীর ডাকের মতনই কিন্তু ঠিক যেন পেঁচার ডাক নয়। তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়াতে সেও কক্ষের বাহিরে আসিল। স্বামী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছেন বুঝিয়া সে উপরের সিঁড়ি দিয়া ছাদে গিয়া উঠিল, সেখান হইতে ব্যাপারটার কিছু কিনারা হইতেও পারে! যেদিক হইতে শব্দটা আসিয়াছিল, সেদিকে কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া থাকিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না। সুতরাং শব্দটা পেঁচারই চীৎকার হইবে এইরূপ ভাবিয়া লইয়া সে সেদিকে বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিল না। পাখীটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি ডালপালার অন্তরালে অথবা ছাদের কোণে কানিশের উপর কোথাও বসিয়া আছে—স্বামী এই সুযোগে হঠাৎ কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মনের কোণে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছিল তাহাই সামলাইয়া লইলেন। তারা নীচে নামিতে যাইবে এমন সময় সহসা দেখিল, একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি তাহাদের খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইতেছে—বাড়ির কোনও স্ত্রীমূর্ত্তি তাহা নয়—স্পষ্ট পুরুষের মূর্ত্তি। ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া তারা বুঝিল মূর্ত্তিটি স্বামীর—মথুর দরজা পার হইয়া দ্রুতবেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। তারা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার ভয় হইল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। সহস্র অনিশ্চিত আশঙ্কা ও যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ তাহার মনে ঝড়ের মত বহিয়া গেল। তাহার স্বামী অপদার্থ হওয়া সত্ত্বেও সে তাহাকে ভালবাসিত, কোনও পৈশাচিক পাপকার্য্যে যে সে সহায় হইতে পারে, এরূপ ভাবা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তথাপি

স্বামীর ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তাহার মন বিষণ্ণ হইল। সে সেখানেই প্রায় স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল ; নীচু আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে স্থির অথচ উদাস দৃষ্টিতে স্বামীর প্রত্যেকটি গতি-বিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হঠাৎ আর সে স্বামীকে দেখিতে পাইল না। তবু সে সেদিকেই চাহিয়া রহিল—অন্ধকারের মধ্যে সবল দীর্ঘ মথুরের কোন চিহ্নই সে দেখিল না। সে এদিক ওদিক চাহিল—তাহার ভয় দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই বৃহৎ প্রাসাদের শিখরে অবিচলিত ভাষাহীন মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত শোভমানা তারা অনেক—অনেক ক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নেত্রে অরণ্যের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে হতাশ হইয়া স্বামীর সন্ধান ছাড়িয়া দিবে, এমন সময় সহসা তাহার প্রার্থিত মূর্ত্তি তাহার চঞ্চল দৃষ্টিপথে পড়িল। মথুর তখন (পাঠকের নিকট) 'গুদাম-মহল' নামে পরিচিত বাড়ির পরিত্যক্ত অংশ হইতে বাহির হইবার ক্ষুদ্র লৌহ-দরজা দিয়া নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল।

স্বামীকে নিজ গৃহের অংশ বিশেষে দেখিতে পাইয়া তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। তথাপি তাহার ভয় তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। বাড়ির বাহিরে স্বামীর এই নৈশ গোপন অভিসার, রাত্রির এই প্রহরে এবং বাড়ির এই অংশে যেখানে কেহ সচরাচর পদার্পণ করে না, সেখানে তাহার গতিবিধি—পূর্ব্বের আশঙ্কা ও ভীতি এবং সেই নিশাচর পক্ষীর অশুভ চীৎকার, যাহা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—এই সব কিছু মিলিয়া তারার মনে অজ্ঞাত কোনও বিপদের সূচনা করিতেছিল। তারা তাহার পর্য্যবেক্ষণ-স্থান পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় স্বামীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আবার কিছুকাল সে কিছুই দেখিতে পাইল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল, তাহার স্বামী সেই গুপ্ত দরজা দিয়া আর ফিরিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার স্বামীর ব্যক্তিগত কোনও বিপদাপদ

ঘটার কোনও আশঙ্কা নাই বুঝিয়া সে পুনরায় নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ তাহার মনের অন্ধকারে সে যেন আলোকরেখা দেখিতে পাইল। আচ্ছা, এই ঘটনার সহিত তাহার স্বামীর গুপ্তকথার কোনও সম্বন্ধ নাই তো! তারা কি করিবে স্থির করিয়া ফেলিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মথুর সে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাকে আরও অস্থির আরও চঞ্চল দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চোখের কোণে যেন একটা গর্ব্বের আনন্দ! তারা যাহা দেখিয়াছে, সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা বন্দী করিল ও যে বন্দী হইল

আমাদিগকে দৃশ্যান্তরে যাইতে হইবে। ঘরখানি দেখিলে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, মেঝে হইতে ছাদের দূরত্ব অতি সামান্য; একটি মাত্র প্রদীপের ক্ষীণ আলোক গম্ভীরদর্শন স্থূল প্রাচীর-গাত্রে পড়িয়া ঘরখানিকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। কক্ষটি আকারে ও আয়তনে এত ক্ষুদ্র, ইহার উচ্চতা এমন কম যে, দেখিলে মনে হয়, সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য ইহা সৃষ্ট হয় নাই, অপরাধীদিগের উপযুক্ত করিয়াই ইহা নির্ম্মিত। কক্ষটির একটি মাত্র দরজা, ক্ষুদ্র কিন্তু স্থূল লৌহ-নির্ম্মিত; দরজার আয়তনের তুলনায় ইহার হুড়কা ও খিল একটু বিরাটই বলিতে হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই কক্ষটির দৃঢ়তায় সন্দিহান হইয়াই যেন গৃহনির্ম্মাতা অদ্ভুত সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য লৌহের পাত দিয়া সমস্ত কক্ষটি মুড়িয়া দিয়াছে। সেই অস্পষ্ট কম্পমান আলোকে কৃষ্ণবর্ণ ধাতু যেন ভ্রূকুটি করিতেছিল, মানুষকে জীবন্ত কবর দিবার যেন প্রতীক্ষা

করিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত লৌহদ্বার ব্যতীত যাতায়াতের আর একটি সত্য অথবা নকল পথ এই কক্ষে ছিল। আগেরটির মতন ইহাও একটি দরজা, কক্ষের এক কোণে অবস্থিত এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পার্শ্ববর্ত্তী কোনও কক্ষে এই দ্বার দিয়া গমনাগমন চলে। ইহা কিন্তু আয়তনে আরও ক্ষুদ্র, এত ক্ষুদ্র যে একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়া সেই দরজা পার হইতে পারে। যে ভীষণদর্শন কক্ষটির কথা হইতেছিল, তাহাতে আসবাব-পত্রাদি কিছুই ছিল না—তাহা সম্পূর্ণ খালি ছিল। কক্ষের একটি মাত্র অধিবাসী, একজন পুরুষ—কক্ষস্থিত প্রদীপের অস্পষ্ট কম্পমান আলোকে প্রতীয়মান হইতেছিল যে, সে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছে। পুরুষটি আর কেহই নহে, আমাদের মাধব ঘোষ।

পাঠকের বিস্মিত হইবার কারণ নাই; মাধবকে যাহারা বন্দী করিয়াছিল, তাহারা এইখানেই তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। গভীর নিশীথের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে। দরজার অর্গল বাহির হইতে বন্ধ ছিল এবং মাধব ঘোষ অন্তত বর্ত্তমানে কিছুকালের জন্য জীবন্ত কবরে সমাহিত হইয়াছিল। তথাপি তাহার নির্ভীক চিত্ত দমিয়া যায় নাই, তাহার আশাভঙ্গ হয় নাই। একটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব তাহার মনকে আশ্রয় করিয়াছিল। সেই নির্জ্জন কক্ষে দীর্ঘপদসঞ্চারে পায়চারি করিতে করিতে মাধবের মনে এই সঙ্কল্প জাগ্রত হইল যে, যে ভয়ঙ্কর চরিত্রের দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের কোনও অত্যাচারকেই সে গ্রাহ্য করিবে না।

অবশেষে দরজার বাহিরের তালার চাবি খোলার শব্দ হইল। তাহার পর খিল খোলার শব্দ; হুড়কো এবং শিকল খুব সাবধানে খোলা হইল; সেই বিরাট দরজার পাল্লা দুইটির কব্জা ক্যাঁচক্যাঁচ করিয়া উঠিল এবং যে দুই বর্ব্বর দস্যু তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তেমনই সাবধানতার সহিত দরজা বন্ধ করিল।

মাধব অসীম ঘৃণাভরে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহাদের আগমন যেন সে লক্ষ্যই করে নাই এমন ভাবে পূর্ব্ববৎ পদচারণা করিতে লাগিল। সর্দ্দার ও ভিখু উভয়েই প্রদীপের কাছ ঘেঁষিয়া বসিল। ভিখু কটিদেশপ্রলম্বিত একটি ঝুলি হইতে সামান্য পরিমাণ গাঁজা ও অতি ক্ষুদ্র মস্তকবিহীন একটি কলিকা বাহির করিয়া গাঁজাটুকু বাঁ হাতের তালুতে রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল চাপ দিয়া তাহা টিপিতে লাগিল—গাঁজা কলিকায় সাজিবার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হয়। সর্দ্দার ততক্ষণে বাতিটা একটু উস্কাইয়া লইতে লইতে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু যে দেখছি আজ রাত্রে বড় ভাল মানুষটি !

পায়চারিরত মাধব একটু থামিয়া দুর্ব্বৃত্তের মুখের দিকে চাহিল; তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল যেন সে কিছু একটা জবাব দিবে। কিন্তু সে তাহা না করিয়া সহসা পিছন ফিরিয়া পূর্ব্বের মত নিঃশব্দে পায়চারি করিতে লাগিল। ততক্ষণে গাঁজা প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দস্যু দুইজন তাহা টানিতে শুরু করিয়াছে। বন্দীর নীরব ঘৃণায় তাহারা যেন উত্যক্ত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও অপমানসূচক কথাবার্ত্তা হইতে তাহারা বিরত ছিল। সাধারণত দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে অতি নীচ হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য বর্ব্বরও দূর হইতে তাহার সম্মান বজায় রাখিয়া চলে; তাহাদের মনে কেন জানি না, একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়া থাকে। পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন, সর্দ্দার ঠিক সে শ্রেণীর বর্ব্বর ছিল না। তথাপি বন্দীর গর্ব্বিত দৃষ্টি ও কঠোর গাম্ভীর্য্য তাহাকে রসিকতার অবকাশ দেয় নাই। কিন্তু গঞ্জিকার ধূমে তাহার সংযম টলিয়া গেল।

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সে বলিয়া ফেলিল, বাবু, কল্কিতে দু-একটা টান দিয়ে দেখবেন ? শপথ ক'রে বলছি গাঁজা যা সাজা হয়েছে, তাতে লাখোপতিও দুই-এক টান দিলে দোষ হবে না।

মাধব তবুও কোনও কথা বলে না। সর্দ্দার যেন একটু দমিয়া গেল। সে ঘন ঘন গাঁজায় দম দিতে দিতে তাহার সঙ্গীর সহিত কুৎসিত বাক্যালাপে রত হইল।

পরিশেষে মাধব তাহার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার মনিব আমাকে নিয়ে কি করতে চায়, বলতে পার? আমাদের কোনও মনিব নাই, গজ গজ করিতে করিতে এই কথা বলিয়া সর্দ্দার আবার গাঁজা ও অশ্লীল কথাবার্ত্তায় রত হইল।

মাধব আবার বলিল, মনিব না হোক, এ কাজে তোমাদের যে ভাড়া করেছে সে --

পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে সর্দ্দার জবাব দিল, ভাড়া আমাদের কেউ করে নি।—সে গাঁজা টানিয়াই চলিল।

—এ কাজ যার হুকুমে তোমরা করেছ—মাধব বলিল।

—কারো হুকুমে নয়।—সর্দ্দার জবাব দিল।

—কেউ নয়? তবে কি আমাকে নিয়ে খেলা করবার জন্যে আমাকে ধরে এনেছ?

সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, খেলা নয়। আমাদের টাকার দরকার, টাকা চাই।

গর্ব্বিত সর্দ্দারের বিশ্বাস ছিল যে, সে ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী লোকদের আতঙ্কস্বরূপ, তাহাদের প্রতিপত্তি নষ্ট করাই তাহার কাজ; মাধবের শান্ত সংযত ব্যবহার ও উদ্ধত ভাষা তাহার সেই গর্ব্বে আঘাত করিল। সেও মাধবকে উত্তর-প্রত্যুত্তরে আঘাত দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

মাধব প্রশ্ন করিল, টাকা তোমাদের দেবে কে?

সর্দ্দার বলিল, ভেবে দেখ।

—সে ভাবনা আমার নয়।

একটা গভীর চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত শব্দে কথোপকথননিরত ব্যক্তিরা চমকিয়া উঠিল।

ভিখু বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, ও আবার কি?

সর্দ্দারও বিস্মিত হইয়াছিল, সেও বলিয়া উঠিল, তাই তো, ওটা আবার কি?—তিনজনেই কিয়ৎকালের জন্য নীরব রহিল।

সর্দ্দার বলিল, এ ঘরে আর কেউ আছে নাকি? তা হ'লে ব্যাপারটা মন্দ গড়ায় না। দেখি।

তাহারা যেখানে বসিয়া ছিল, সেখান হইতেই সেই অস্পষ্ট আলোকেই ঘরের সমস্ত অংশ যতদূর সম্ভব দৃষ্ট হইতেছিল—সর্দ্দার তথাপি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরের সকল কোণই পরীক্ষা করিল। কিন্তু আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে বলিল, অবাক কাণ্ড বটে! মরুকগে যাক। হুজুর আমার মনিবের কথা বলছিলেন, তিনি কে হুজুরের জানা আছে কি?

তাহার ভাষা ও কণ্ঠস্বরে মাধব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বিরক্তি চাপিয়া সে সংক্ষেপে জবাব দিল, হ্যাঁ জানি, মথুর ঘোষ। তার মতলবটা আমাকে জানাবে কি?

ভিখু বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ফেলিল, সর্দ্দারের কানে কানে বলিল, ব্যাপার কি, সব জেনে ফেলেছে দেখছি!

সর্দ্দার তেমনই চাপা গলায় বলিল, বোকার ডিম, এতে অবাক হবার কি আছে! রাধানগরে আর কার এমন লোহার পাতমোড়া কয়েদখানা আছে?

কিন্তু সে মাধবের প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না; মাধবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার সঙ্কল্পবশতও বটে, আবার তাহাকে একটু খেলাইয়া তাহার নিজের মতলব হাঁসিল করিবার জন্যও বটে, সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু গাঁজার ধোঁয়ায় ভিখুর মেজাজ তখন চড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সাধারণত

কথা কম বলে, কিন্তু গঞ্জিকা-মহিমায় তাহার সে মৌন-বাঁধ দ্রুত ভাঙিতে শুরু করিয়াছিল।

সে বলিয়া উঠিল, ভালরে ভাল, আমরা টাকা চাই, ও রক্তমাংসের জীবটিকে নিয়ে করব কি!

সর্দ্দার বলিল, খেয়ে ফেল্, গিলে ফেল্—

সর্দ্দারের রসিকতায় ভিখু কর্কশ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার হাসি সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই ভয়ে তাহার মুখের হাসি মুখে মিলাইল; আবার সেই চাপা আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল; এবার যেন ঠিক ছাদের কাছ হইতে শব্দটা আসিতেছিল।

আতঙ্কিত সর্দ্দার চীৎকার করিয়া উঠিল, আবার!

ভিখু তখন ভয়বিমূঢ়, অপদেবতাদের কথা তাহার মনে ভিড় করিয়া আসিতেছিল। মাধবও অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, কিন্তু অন্য কারণে।

ভিখু ফিসফিস করিয়া বলিল, জায়গাটা অনেক দিন খালি পড়েছিল, কে জানে সেই সুযোগে তাঁরা সব এখানে ডেরা বেঁধেছেন কি না!

অধিকতর সাহসী সর্দ্দারের মনে যদিও অপদেবতাদের যথেষ্ট ভয় ছিল, তথাপি সে খানিকক্ষণ সে ভয়কে আমল দিল না। এই সকল দস্যুদের উপজীবিকাই এরূপ যে, তাহাদিগকে এমন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন ভয়সঙ্কুল স্থানে সচরাচর চলাফেরা করিতে হয়—যেখানে গেলে সাধারণ লোকের নানাবিধ অপদেবতার ভয় জাগা স্বাভাবিক। তাহাদের অশিক্ষিত মনে ভয় যে থাকে না তাহা নয়, তবু অভ্যাসবশত তাহারা নিজেদের অনেকটা শক্ত করিয়া রাখে।

সর্দ্দার বলিল, হয়তো আশেপাশে কেউ লুকিয়ে আছে, আমি দেখছি। ভিখু, তুই বাবুর ওপর নজর রাখ্।

সর্দ্দার ধুতির খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া সলিতার মত পাকাইয়া প্রদীপের তৈলে তাহা সিক্তিত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল এবং

এই অপরূপ দীপ হস্তে সাবধানে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। বারান্দার সমস্ত অন্ধিসন্ধি সে খুঁজিয়া দেখিল। পাশাপাশি তিনটি ঘর, মাঝেরটিতে মাধবকে ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; এই তিনটি ঘরসংলগ্ন বারান্দাটা। বারান্দায় কিছু না দেখিতে পাইয়া সে প্রাচীরবেষ্টিত সামনের খোলা উঠানে নামিয়া খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু ফলোদয় হইল না। সে বিরক্ত হইয়া সন্দিগ্ধভাবে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিল। ভিখু এতক্ষণে সত্যসত্যই আতঙ্কিত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সে সর্দ্দারের কনুইয়ে চিমটি কাটিয়া ইশারায় শীঘ্র কাজ সারিয়া লইতে বলিল।

সর্দ্দার বুঝিল, বলিল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এটা আমাদের ঘুমোবার জায়গা নয় মাধববাবু। আমাদের শর্ত্তে যদি রাজি হও, তোমাকে এখুনি ছেড়ে দি।

মাধব নিজের সুবিধাটা হৃদয়ঙ্গম করিল, তাচ্ছিল্যভরে সে বলিল, কি শর্ত্ত?

—তোমার খুড়োর উইলটি আমাদের হাতে দাও।

বিশেষ না ভাবিয়া মাধব জবাব দিল, সেটা তো এখানে আমার কাছে নেই।—মাধব আবার পায়চারি করিতে লাগিল।

সর্দ্দারও সংক্ষেপে বলিল, তা হ'লে এখানেই পচে ম'র, আমরা চাবি নিয়ে চললাম।

—আচ্ছা ধর, উইলটা আমি দিতেই চাই, এখানে থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করি কি ক'রে?

দস্যু এবার নিজের সুযোগ বুঝিল, বলিল, সে ব্যবস্থা তুমিই করবে। একটা মতলব ঠিক ক'রে ফেল। তোমার অবস্থায় পড়লে আমি, যারা আমাকে বন্দী করেছে, তাদেরই কারু হাতে বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাতাম, তার হাতে উইল পাঠিয়ে দিতে বলতাম।

—যদি বাড়িতে জিজ্ঞেস করে, আমি কোথা থেকে চিঠি দিচ্ছি, কি জবাব দেবে ?

পুনরায় সেই অপার্থিব শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। একটা অত্যন্ত চাপা মৃদু আর্ত্তনাদ—মানুষে সে প্রকার শব্দ করিতে পারে না। এবারও মনে হইল ছাদ হইতে শব্দটা আসিতেছে।

দস্যু দুইজন ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল ; মাধবও বিচলিত হইল।

সে প্রশ্ন করিল, দোতলায়, ঠিক ওপরে কি ঘর আছে ?

উভয় দস্যুই সমস্বরে জবাব দিল, না, না।

সর্দ্দার বলিল, দাঁড়াও, আমি ছাদে গিয়ে দেখছি।

সর্দ্দারের মত পাকা ডাকাতের পক্ষে অনতিউচ্চ ছাদে উঠা কঠিন হইল না। লাফাইয়া প্রাচীর বাহিয়া সে ছাদে উঠিল, কিন্তু সেখানে কিছুই দেখিতে পাইল না। ছাদের আলিসায় ভর দিয়া সে বাড়িটির পিছনের দিকে নীচে চাহিয়া দেখিল। কোথায়ও কিছু নাই। বিরক্ত ও চিন্তান্বিত অবস্থায় সে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মাধব যেন সহসা একটা কিনারা দেখিতে পাইল। সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এই ঘরের পাশে আরও দুটো ঘর আছে, না ?

সর্দ্দার বলিল, হ্যাঁ, সেই রকমই তো বোধ হয়।

—আর কাউকেও কি ওই ঘরের কোনটাতে ধ'রে এনে রেখেছ ?

—না।

—হয়তো আর কেউ ধ'রে এনেছে। মনে হচ্ছে ওই শয়তানের কবলে প'ড়ে আর কোনও হতভাগ্য ভীষণ দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে আর্ত্তনাদ করছে। —মাধব যেন আত্মগতভাবেই কথাগুলি বলিল।—গিয়ে দেখতে পার ওখানে কেউ আছে কি না ?

সর্দ্দারও প্রায় নিজের মনেই বলিল, তুমি বোধ হয় ঠিক ধরেছ।

দরজায় নিশ্চয়ই তালা দেওয়া আছে। তা হ'লেও আমি চেঁচিয়ে প্রশ্ন করব, কেউ ভেতরে থাকলে জবাব পাব নিশ্চয়ই।

সর্দ্দার পুনরায় আর একটি সলিতা পাকাইয়া তাহা লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দুইটি ঘরের দরজাই খোলা—কেহ কোথাও নাই।

মাধব এবার সত্য সত্যই বিস্ময়বিমূঢ় হইল। সে বুঝিতে পারিল যে, যেখানে যেখানে লোক থাকা সম্ভব সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করা হইয়াছে। দস্যু-সর্দ্দার এইবার অপদেবতার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্ক-বিহ্বল ভিখু সর্দ্দারের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

সর্দ্দার মাধবকে বলিল, দেখ আমরা আর এখানে থাকব না। দেবতাদের গতিবিধি দেবতারাই জানেন। তোমার কিছু বলবার থাকে বল, নইলে তোমাকে বন্ধ ক'রে আমরা চললাম।

মাধব দেখিল, তাহাদের শর্ত্তে রাজি না হইলে আর উপায় নাই। যদি তাহারা দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, আবার যে কবে সে বন্ধ দরজা খুলিবে কেহ বলিতে পারে না। যদি সে রাজি হয় তাহা হইলে এমনও হইতে পারে যে, তাহার চিঠি দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার আত্মীয়দের কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারে। সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিল।

সর্দ্দারকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, তোমার দরকার টাকা, উইলটা যদি তুমি পাও তা হ'লে কিছু টাকাও পাবে। কত টাকা তুমি পাবে আমাকে বল, আমি তার দ্বিগুণ দিচ্ছি—উইলের বদলে টাকা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

—না, না। অততে আমাদের দরকার নেই। আমরা এত বোকা নই যে বিশ্বাস করব তোমাকে। একবার ছাড়া পেলে তুমি আমাদের কলা দেখাতে ছাড়বে না। চিঠি দাও, নইলে আমরা চললাম।

ঘরের ভিতরেই কোথায় যেন কাপড়ের খস খস আওয়াজ হইল। দস্যুরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল, আর অপেক্ষা না করিয়া পলায়ন করাটাই যেন তাহারা নিরাপদ মনে করিতেছিল। মাধব তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিল, সে কাগজ ও কলম চাহিল। কাগজ-কলম তাহাদের সঙ্গেই ছিল। মাধব কাগজ-কলম লইয়া বাড়িতে প্রধান আমলার নামে চিঠি লিখিতে বসিল।

সর্দ্দার বলিল, আমি ব'লে যাই, তুমি লেখ; ফাঁকি দিয়ে যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সেটি আমি হতে দিচ্ছি না। মনে রেখো, আমি এক সময় তোমার মত লিখতে পড়তে জানতাম।

মাধব অবাক হইয়া সর্দ্দারের দিকে চাহিল। সে সর্দ্দারের কথায় রাজি হইয়া তাহার নির্দ্দেশমত লিখিতে বসিল। সর্দ্দার বলিতে শুরু করিল, কিন্তু তখন অপদেবতার ভয় তাহার মনে নানা উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল, সে শান্তভাবে চিঠি লিখাইতে পারিতেছিল না। মাধব লিখিতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে শিকলের গভীর ঝনঝন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল দাপাদাপির আওয়াজ বজ্রনির্ঘোষের মত সেই ভীত আতঙ্কিত দলের কানে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই সেই অপার্থিব আর্ত্তনাদ—আরও উচ্চ আরও কর্কশ। ভিখু এক লাফে বারান্দায় পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল। সর্দ্দারও বিচলিত হইয়া বারান্দায় আসিল। সে সেখানে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতেই আতঙ্কবিমূঢ় হইয়া দরজায় তালা বন্ধ করিবার অপেক্ষা না করিয়াই, পিছনে না চাহিয়াই দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল। মাধব সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিল।

ওই সকল অলৌকিক শব্দ এবং দস্যু দুইজনের অতর্কিত পলায়নে মাধব স্বয়ং এতদূর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল যে, নিজের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। সে কিয়ৎকালের জন্য স্থাণুর

মত দাঁড়াইয়া রহিল, কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া রমণীসুলভ ভয় পরিত্যাগ করিয়া বারান্দায় লাফাইয়া পড়িল। কিছুই প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইল না। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল, বারান্দার একটি দরজা হইতে খোলা উঠানে একটি আলোকরেখা পতিত হইয়াছে। সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সে ধাবমান হইল, দেখিল, দরজাটি উন্মুক্ত এবং একজন রমণী সেই নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। একটি ছোট লণ্ঠন মাটির উপর রক্ষিত। সেই লণ্ঠনটি হাতে তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া মাধব যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মাধব সবিস্ময়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তারা !

তারাও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়াছিল, সে বলিল, মাধব !

কিন্তু উপর হইতে তখনও সেই ব্যথিত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তারা ও মাধব

শৈশব হইতেই মাধব ও তারা পরস্পর পরিচিত। তারার পিতা ও মাধবের মাতামহ একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; শৈশবাবস্থায় মাধব ঘন ঘন সেখানে যাতায়াত করিত, তারা এই সময়ে তাহার খেলার সঙ্গিনী ছিল। দূর হইলেও তাহাদের পরস্পরের একটা সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্ক হেতুই অতি শিশুকাল হইতে তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া খেলা করার সুযোগ পাইয়াছিল। তারা মাধব অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের বড় হওয়া সত্ত্বেও মাধব তাহাকে 'তারা' বলিয়াই ডাকিত। মথুরের সহিত তাহার বিবাহ হইলেও তাহাদের পরস্পরের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই, শৈশবের অবাধ মিলনের ফলে যে প্রীতি তাহারা পরস্পরের

প্রতি অনুভব করিত তাহা অক্ষুণ্ণই ছিল। খুড়ীর সহিত মাধবের মকদ্দমায় অপরিমিত বিষয়লোলুপতাবশত গোপনে গোপনে মথুর তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, এ কথা মাধবের অবিদিত ছিল না, এবং সেই হইতেই দুই জ্ঞাতিভ্রাতার পরস্পর সৌহার্দ্যে ছেদ পড়ে। পূর্ব্বে যে মাধব ঘন ঘন মথুরের গৃহে যাতায়াত করিত তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। মথুর অপেক্ষা মাধব বয়সে অনেক ছোট হওয়ার দরুন জেনানা আইনে তারার সহিত মাধবের প্রায়শ কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনায় বাধিত না; মাধবও যথাসম্ভব এই সুযোগ লইতে ছাড়িত না। পরস্পর এইভাবে ভাবের আদান-প্রদান উভয়ের পক্ষেই প্রীতিকর ছিল, কারণ উভয়ে উভয়কেই শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু এই সম্প্রীতির মধ্যে মনের কোনও কলুষ ছিল না। শৈশবের ভালবাসা পরবর্ত্তী জীবনে প্রতিদিনকার ব্যবহারে এবং পরস্পরের নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিল, ভ্রাতা ও ভগিনীর ভালবাসার সহিত যাহাকে পৃথক করা যায় না।

এতদসত্ত্বেও গুদাম মহলে মাধব ও তারা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন উভয়েই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিয়ৎকালের জন্য কেহই কোনও কথা বলিতে পারিল না। তারা প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিল। বলিল, মাধব, তুমি এখানে?

মাধব পালটাইয়া তারাকে প্রশ্নটা করিতে পারিল না এবং কি জবাব দিবে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারাও এই অদ্ভুত অবস্থাবিপর্য্যয়ে পড়িয়া বিমূঢ় হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা সহজেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। তাহার নিজের চরিত্রের উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল এবং অপর-পক্ষের নিকট হইতেও ভয়ের যে কোনও আশঙ্কা নাই তাহাও সে ভাল করিয়াই জানিত; তাহার প্রতি মাধবের শ্রদ্ধা যে কতখানি তাহার তাহা জানিতে বাকি ছিল না।

সুতরাং ব্যাপারটার একটা সুরাহা হওয়া প্রয়োজন এই বিবেচনা করিয়া তারা প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপো, প্রথমে আমাকে বল যমদূতের মত যে দুজন লোক এখনই ছুটে বেরিয়ে গেল, ওরা কে ? ও ধরনের লোকের সঙ্গে এখানে আমাদের বাড়িতে তোমার কি দরকার থাকতে পারে, তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আমি যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন ওদের মধ্যে একজন আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়েছিল, আমাকে পেত্নী ভেবেই বোধ হয় ভয়ে পালিয়ে গেল।

—তা হ'লে তুমিই ওই দরজাটা খুলে শেকলের আওয়াজ করেছিলে ?

—হ্যাঁ, দরজা আমিই খুলেছিলাম বটে, দরজা খুলে তুমি যে ঘর থেকে বের হ'লে সেই ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ এই দুটো যমদূতকে দেখে ভয় পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম।

—কিন্তু ওই শব্দ আসছিল কোত্থেকে ?

—শব্দ ?

—তুমি অদ্ভুত কোনও আওয়াজ শোন নি ?

—শুনেছি, যন্ত্রণার চাপা আর্ত্তনাদ, আমার মনে হ'ল, সেটা তোমার ঘর থেকেই আসছিল।

—না।

—না ? আমাকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাচ্ছ না ? তা হ'লে আমি ফিরে যাব।

—আমি এখানে কেন এসেছি, না জেনেই ফিরে যাবে ?

—না না, বল, তুমি এখানে কেন এসেছ, আমার এখানে আসবার কারণও বলব। তাড়াতাড়ি কর।

মাধব জবাব দিল, স্বচ্ছন্দে ; কিন্তু তার আগে একটু সাবধান হয়ে নিই। এ কথা কেন বলছি ক্রমশ বুঝতে পারবে।

মাধব একবার বাহিরে গেল এবং গুদাম-মহল হইতে বাহিরে যাইবার

দরজার ভারী হুড়কোটি খুলিয়া দিল। তাহার পর যে ঘরে কয়েদ ছিল, সেই ঘরেই সে ফিরিয়া গেল—তারাকে সঙ্গে যাইতে বলিল। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে সে তাহার বন্দী হওয়ার ইতিহাস বলিতে শুরু করিল। সে কিছু গোপন করিল না অথবা বাড়াইয়া বলিবারও চেষ্টা করিল না। তাহার মনে ঘৃণা ও বিরক্তির অন্ত ছিল না এবং এ বিশ্বাসও ছিল যে তারা তাহার স্বামীকে যতই ভালবাসুক তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা কিছুতেই তাহার ঘৃণিত ব্যবহারকে সমর্থন করিতে দিবে না। তারা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল, নৈরাশ্যে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

তারা বলিল, তা হ'লে আমি যা খুঁজতে বের হয়েছি তুমি তা নয়, তুমি সবে এই সন্ধ্যায় এখানে এসেছ, কিন্তু যে সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে আমি এখানে এসেছি, দুদিন আগে সেই সন্দেহের কারণ ঘটেছে।

তারা কেন সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা খুলিয়া বলিল। পাঠককে তাহা বিস্তারিতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বামীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া সে নানা সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় নিজে পীড়িত হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর চিন্তার কোনই কারণ স্থির করিতে পারে নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সে জবাব পায় নাই। সে লুকাইয়া লুকাইয়া স্বামীকে চোরের মত গুদাম-মহলের দিকে যাইতে দেখিয়াছে এবং তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, কারণ সেখানেই নিহিত। গুদাম-মহলে যেমন করিয়া হউক, প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া সে সেই কারণ জানিবে, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘুমন্ত স্বামীর বালিশের তলা হইতে চাবি চুরি করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

তারা বলিতে লাগিল, সেই চুরি-করা চাবি নিয়ে আমি যখন এই ভীষণদর্শন দেওয়ালের ধারে ধারে এই অন্ধকার পথে আসছিলাম, তখন আমার মনে আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় ও নৈরাশ্যের যে দ্বন্দ্ব চলছিল, তা তুমি অনুভবে বুঝতে পারবে, তা বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু

ফিরে যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না, কোনও অজানা অপার্থিব শক্তি যেন আমাকে টেনে আনছিল। আমার স্বামীর দুঃখ যদি আমি প্রাণ দিয়েও ঘোচাতে পারতাম, তা হ'লে প্রাণ দিতেও আমি দ্বিধা করতাম না। সুতরাং ভেবে দেখ, তোমাকে দেখে আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল প্রথমটা! আমার স্বামীর দুশ্চিন্তার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তুমি বলছ, তুমি মাত্র আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছ। তা হ'লে নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে।

প্রত্যুত্তরে মাধব বলিল, তোমাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না—ওই যে শব্দ—তুমি কোনও শব্দ শোন নি? রহস্যের সমাধান এখনও হয় নি।

তারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

মাধব বলিল, ভয় পেও না, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি, তা বলছি। তুমি যদি আমাকে কথা দাও যে অনাবশ্যক ভয় তুমি পাবে না তবেই বলব—কথা দাও।

তারা বহুকষ্টে চাপা গলায় বলিল, বল। মাধব তখন ডাকাতদের সহিত কথোপকথনকালে যে সকল শব্দ শুনিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিল। সে যতদূর পারিল এমন ভাবে বলিল, যাহাতে তারা ব্যাপারটিকে ভৌতিক কিছু মনে না করে।

অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিন্তায় তারা পীড়িত হইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা দার্শনিক নহে, ভূতের ভয় তাহারা স্বভাবতই করিয়া থাকে। তাহার মনে এই ভূতের ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও ছিল। স্বামীর দুশ্চিন্তার কারণ খুঁজিতে আসিয়া ভয়াবহ এমন কিছুর সন্ধান যে পাইবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। তাহার অনুতাপও হইতেছিল। সে মাধবকে তাহাকে বাড়ির ভিতরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল।

মাধব উত্তেজিত হইয়া বলিল, এত সহজেই হাল ছেড়ে দেবে? আমি তোমাকে শপথ ক'রে বলছি যে, ভয়ের কোনই কারণ নেই।—

মাধবের কৌতূহল এত অধিক পরিমাণে উদ্রিক্ত হইয়াছিল যে, সে নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা এমন কি তারার সঙ্গে এভাবে এমন স্থানে এমন সময়ে একাকী থাকা যে নিন্দনীয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতেই হইবে।

তারা কিয়ৎকাল নীরব রহিল। পরে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, কিন্তু খুঁজবে কোথায়? ডাকাতরা কি কোনও জায়গা খুঁজতে বাকি রেখেছে?

—খুঁজেছে বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা জায়গা তারা দেখে নি। ওই যে দরজা দেখছ।—মাধব আঙুল দিয়া একটা ছোট লোহার দরজা দেখাইল, সেটা এখনও খোলা হয় নি।

—ওটা নিশ্চয়ই ওঘরে যাবার পথ, ডাকাতরা তো ওঘরটা দেখেছে।

এই সময়ে আবার সেই চাপা কাতর আর্ত্তনাদ শোনা গেল। খুব স্পষ্ট, যেন অতি নিকটে কোথায়ও। শ্রোতা দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। যন্ত্রণার সেই আর্ত্তস্বর যেন উভয়কেই পীড়া দিতেছিল।

মাধবের মাথার মধ্যে যেন কে কষাঘাত করিল—একটা অবর্ণনীয় ব্যথায় সেও যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল। তারার হাত হইতে সজোরে চাবির গোছা ছিনাইয়া লইয়া সে লাফ দিয়া সেই লোহার দরজার সমীপবর্ত্তী হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চাবির গর্ত্তে একটি চাবি ঢুকাইয়া দিল। কিন্তু চাবি ঘুরিল না। মাধব উন্মত্তের মত পর পর আরও দুইটা চাবি প্রয়োগ করিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। মাধব পারিলে সেই ধাতুময় দরজা ভাঙিয়া ফেলিত, কিন্তু চতুর্থ চাবিটি লাগাইতেই স্প্রিঙের দরজা এমন সজোরে খুলিয়া গেল যে, মনে হইল যেন হাওয়ায় একটা পালক উড়িল।

উত্তেজিত মাধবের তখন কোনও জ্ঞান নাই। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, তারা, তারা, দেরি ক'রো না। আমার পেছনে পেছনে এস।

বলিয়া সে পাগলের মত দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিল, উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার গা ছড়িয়া গেল।

তারার মনেও তখন সেই উত্তেজনা সংক্রামিত হইয়াছে, তারা আলো লইয়া অগ্রসর হইল। আনন্দ ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক মাধব ইটের একধাপ সিঁড়ি আবিষ্কার করিয়াছে। সিঁড়ি খুব সঙ্কীর্ণ ও খাড়া, মাকড়সার জালে ভর্ত্তি। বাক্যব্যয় না করিয়া মাধব লাফে লাফে সেই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় তারাও দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিল। সিঁড়ি পার হইয়া একটি দরজা—আপাতদৃষ্টিতে দোতলার কোনও ঘরেরই দরজা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে দোতলা নয়। ঘরটির উচ্চতা দেখিয়াই মাধব বুঝিতে পারিল যে, তাহা একটি চোরা-কুঠরি—অতি কৌশলে সকলের দৃষ্টিকে প্রতারিত করিবার জন্যই কুঠরিটি নির্ম্মিত। বাড়ির অন্য কোনও স্থান হইতে এই কুঠরি পরিলক্ষিত হয় না, কারণ একই কামরাকে উপর নীচে ভাগ করিয়া দুইখানি কামরা করা হইয়াছে; পাশের অন্যান্য কামরা ও বারান্দার উচ্চতা এই দুই কামরার সম্মিলিত উচ্চতার সমান হইলেও কোন স্থান হইতে তুলনা করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। উপরের কুঠরি একেবারে জানালাবর্জ্জিত।

মাধব কম্পান্বিত দেহে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় এই দরজার তালা খুলিতে চেষ্টা করিল; দুই-তিনবার বিফল হইয়া আকস্মিক চেষ্টায় রক্তাক্ত আঙুল লইয়া মাধব শেষে সে দরজাও খুলিয়া ফেলিল। ঝন ঝন শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনিতে কক্ষ মুখর হইল। তারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল, তাহার হাতে প্রদীপ—প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাহারা একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিল। বার্নিস-করা মেহগনির একটি খাট—ক্রেপের ঝালরে ঢাকা, এবং খাটের উপর একটি নারীমূর্ত্তি। তারা ও মাধব উভয়েই ছুটিয়া খাটের নিকটে গেল।

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকেই শয্যাশায়িত মূর্ত্তিটি প্রকট হইয়া যাহার কথা মনে করাইয়া দিল সে মাতঙ্গিনী ; শীর্ণ কৃশ, কিন্তু তথাপি অপার্থিব রূপ, সুন্দর।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক নারী অনেক পুরুষের সমকক্ষ

তারা ও মাধব মাতঙ্গিনীর প্রায়-নির্জ্জীব দেহখানি ধরাধরি করিয়া এমন একটি ঘরে লইয়া গেল, যেখানে অন্য কাহারও হঠাৎ প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না। তারার অসাধারণ সেবায় এবং বদ্ধ বায়ুতে অনেক দিন থাকার পর নির্ম্মল মুক্ত বাতাসের স্পর্শে তাহার বিবর্ণ মুখ রক্তাভ হইল এবং উষার অরুণরাগ পূর্ব্বগগন রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বেই মাতঙ্গিনী পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। তাহাকে আহার্য্য দেওয়া হইল, কিন্তু মাতঙ্গিনী সামান্যই আহার করিল। কিন্তু তাহাতেই সে অনেকটা বল পাইল। তারা জানালার উপর বসিয়া ধূসর পূর্ব্বাকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া মাতঙ্গিনীর দুঃখের ইতিহাস শুনিতে লাগিল। মাতঙ্গিনী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে সে কেমন করিয়া জীবিত অবস্থাতেই মৃতের কবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই বলিতেছিল।

সংক্ষেপে সেই অন্ধকার ইতিহাস এইরূপ। মথুর ঘোষ সুকীর মায়ের সঙ্গে যখন তাহাকে তাহার বাড়িতে পাঠাইয়াছিল, তখন মাতঙ্গিনী ধারণা করিতেই পারে নাই যে, কি সাংঘাতিক রাক্ষসের কবলে সে পতিত হইয়াছে। সুকীর মাকেও যথেষ্ট তালিম দেওয়া হইয়াছিল, পথে যাইতে যাইতে সে মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর ঘরে তাহার ফিরিয়া যাইতে ভয় হইতেছে কি না!

মাতঙ্গিনী উত্তর করিয়াছিল, সুকীর মা, সত্যি কথা বলতে কি,

যদি পৃথিবীতে অন্য কোথাও যাবার জায়গা আমার থাকত, তা হ'লে সেখানে আমি ফিরতাম না।

সে শয়তানী বলিয়াছিল, সত্যি? আমি কিন্তু তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারতাম। আমি তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারি, যেখান থেকে কেউ তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

মাতঙ্গিনী অনেক চিন্তা করিয়া বলিয়াছিল, না, আমি লুকিয়ে থাকব না; দুষ্টলোকে কুৎসা রটনা করতে পারে।

—তা হ'লে তোমার বোনের বাড়ি চল না কেন?

মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, না, তা হতে পারে না।

বুড়ী কৌশলী কম নহে, সে মাতঙ্গিনীর অসহায় অবস্থার সুবিধা লইয়া তাহার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইবার ভান করিল এবং পরিশেষে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি লইয়া যাইতে চাহিল।

মাতঙ্গিনী দুঃখিতভাবে বলিল, কিন্তু যাবার খরচ তো নেই।

—ও! তা সে তোমাকে ভাবতে হবে না, বড়গিন্নী নিশ্চয়ই তোমাকে নৌকো ভাড়া ক'রে দেবেন, আমি সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সেখানে রেখে আসব।

মাতঙ্গিনী কাঁদিয়াছিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়াছিল।

—আমি গিয়ে তা হ'লে এ কথা বড়গিন্নীকে বলি?

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মাতঙ্গিনী বলিয়াছিল, তাই বল গিয়ে।

—তা হ'লে আমি তোমাকে যেখানে রেখে যাব, সেখানেই চুপ ক'রে থেক, কেউ সেখানে তোমাকে দেখতে পাবে না। এস।

সেই শয়তানীকে অনুসরণ করিয়া মাতঙ্গিনী পূর্ব্ববর্ণিত গুদাম-মহলের চোরা-কুঠরিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ভয়াবহ নির্জ্জন সেই কক্ষে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ভয়ে মাতঙ্গিনীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। কক্ষের

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই নির্জ্জন অন্ধকার ঘরের অপরূপ সজ্জা দেখিয়া সে বিস্মিতও হইয়াছিল। সুকীর মাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সে আরও চমৎকৃত হইয়া দেখিয়াছিল যে, বুড়ী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এবং বাহির হইতে দরজাও বন্ধ।

বুদ্ধিমতী মাতঙ্গিনী অবিলম্বে বুঝিতে পারে যে সে ফাঁদে পা দিয়াছে এবং সেই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই।

সন্ধ্যায় মথুর ঘোষ আসিয়া আপনাকে তাহার চরণপ্রান্তে নিক্ষেপ করে, মাতঙ্গিনী তাহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করায় আহত ও ব্যথিত মথুর মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয় যে, যেমন করিয়াই হউক সে তাহার প্রতিহিংসা ও লালসা চরিতার্থ করিবে।

মথুর বিদায় লইবার সময় পৈশাচিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলে, তোমাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, প্রাণেশ্বরী।

মাতঙ্গিনীর দৃষ্টিতে যে আগুন ঝলকিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কুড়িজন পুরুষের দৃষ্টি প্রতিহত হয়। সে বলিল, কখনই না, কখনই আমি তোমার হব না।—তারপর সে মথুরের ঠিক সম্মুখে গিয়া দীর্ঘ দেহ দীর্ঘতর করিয়া বলিয়াছিল, দেখ, আমার দিকে চাও, আমি নারী হ'লেও যুবতী, গায়ের জোর তোমার চাইতে আমার কম নয়;—না, তুমি বুঝি সাঙ্গোপাঙ্গ ডাকবে?

মথুর ঘোষ শক্তিপরীক্ষার এই অপরূপ আহ্বানে স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মস্থ হইয়া সে বলিয়াছিল, তোমার জঠরাগ্নি আমার সাহায্য করবে, স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে আমি অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করি না।

মাতঙ্গিনী বলিয়াছিল, হ্যাঁ, উপবাসই আমার একমাত্র সহায়।

মথুর স্থির করিয়াছিল মাতঙ্গিনীকে খাইতে না দিয়া তাহার প্রস্তাবে রাজি করাইবে, মাতঙ্গিনী স্থির করিয়াছিল সে উপবাস করিয়া মরিবে।

উভয়ে উভয়ের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল। মথুর প্রত্যহ একবার দেখিয়া আসিত তাহার ঔষধ ধরিতেছে কি না! মাধব যখন মাতঙ্গিনীকে উদ্ধার করিল, তখন সে অনাহারে মৃতপ্রায়।

ভোর হইবার পূর্ব্বেই মাধব চলিয়া গেল, দুর্ব্বলতাবশত মাতঙ্গিনী তখনই যাইতে পারিল না; মাধব ও তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাতঙ্গিনী তারার কাছেই থাকিবে, করুণা আসিয়া সন্ধ্যার পর তাহাকে লইয়া যাইবে।

মাধবকে নিরাপদে বাড়ির বাহিরে পাঠাইয়া তারা মাতঙ্গিনীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, এবার তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পালা তাহার—এই বলিয়া সে সাবধান হইবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারা তারপর স্বামীর কক্ষে ফিরিয়া চাবির গোছা যথাস্থানে রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিল, যেন রাত্রিকালে সে বাড়িতে একটি মূষিকও নড়াচড়া করে নাই, এইরূপ ভাব। শয়ন করিয়া তারা কি নিদ্রা যাইতে পারিল? না, সে স্বামীর গোপন কথাটি জানিয়াছে এবং তাহার উদার মনে সে জ্ঞান অসম্ভব দুঃখ বহন করিয়া আনিয়াছে। সেই রজনীর দৃশ্যপটে যাহার যাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বিশ্বস্তা এবং প্রেমময়ী পত্নীই তাহাদের মধ্যে যন্ত্রণা ভোগ করিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—স্বামীর গুপ্ত রহস্যের জঘন্যতায় সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

মাতঙ্গিনী সমস্ত দিনটা তাহার নির্জ্জন কক্ষে নিরাপদে কাটাইল। সন্ধ্যার পরে করুণা পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। বহুদিনের দুর্দ্দশা ও দুঃখ ভোগের পর মাতঙ্গিনী হেমাঙ্গিনীকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

মিলনের আনন্দ কতকটা প্রশমিত হইলে হেম বলিল, দিদি, তুমি বল, আর কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না?

মাতঙ্গিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল

হেম অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল, দিদি, জবাব দিচ্ছ না কেন? হায় হায়, আবার বুঝি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে!

হতাশ হেম পুনরায় বলিল, আচ্ছা দিদি, তুমি কার জন্যে আমাদের ছেড়ে যাবে?

মাতঙ্গিনী বলিল, বাবার কাছে যাব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জীবন-গ্রন্থের শেষ অধ্যায়— এবং এই গ্রন্থেরও

সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় বহিল, চারিদিক কালো হইয়া আসিল। বাতাসের গর্জ্জন, সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রাম বৃষ্টির ধারা, বজ্রনিনাদে আকাশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মথুর ঘোষ একা বসিয়া ছিল। সে যেন ঝড়ের মুহুর্মুহু বিশ্রামের মধ্যে শাঁখের ধ্বনির মত একটা শব্দ শুনিতে পাইল—তাহার মনে হইল, দুইবার সে যেন স্পষ্ট শুনিয়াছে। প্রথমটা সে ভাবিল, যাহাদের সাহায্য তাহার জীবনে কলঙ্ক ও দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে, তাহাদের আহ্বান সে আর গ্রাহ্য করিবে না; কিন্তু ইশারার শব্দ প্রতিবারেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল, আহ্বানের গুরুত্ব মথুর ক্রমশই অধিক অনুভব করিল। অবশেষে সে উঠিয়া পড়িল এবং ঝড় মাথায় করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল—এই স্থানেই বহু কলঙ্কিত অভিনয়ের সূচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে। একটি গাছের নীচে যে মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান ছিল, দস্যু-সর্দ্দার বলিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে মথুরের বিলম্ব হইল না।

একটু ব্যঙ্গ করিয়াই মথুর বলিল, ব্যাপারখানা কি? তোমাদের সঙ্গে অনেক খেলাই হ'ল, এবার আমাকে রেহাই দাও। কলঙ্ক যথেষ্ট হয়েছে—যথেষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা তোমরা করেছ।

সর্দ্দার শান্তভাবে জবাব দিল, জোচ্চুরির কাজ আমরা কিছু করি নি,

যথাসাধ্য ভাল করতেই চেয়েছিলাম। আমাদের যারা সঙ্গী করে, শাস্তি তাদের শেষ পর্য্যন্ত ভোগ করতেই হয়।

শয়তান মহাপুরুষকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে শুরু করিল! পাঠককে প্রশ্ন করি, সে কি অন্যায় করিতেছিল?

মথুর রাগতভাবে বলিল, আমাদের যে আর কোনও সম্পর্ক নেই, তা তুমি নিজেই ভাল জান। এই ঝড়ের রাতে আমাকে ডাকলে কেন?

বিষণ্ণ সর্দ্দার বলিল, কারণ? কারণ এই সময় ছাড়া বাইরে বের হবার উপায় নেই। জান তো পুলিস আমাদের পিছু নিয়েছে।

—তা হ'লে একেবারে রাধাগঞ্জ ছেড়ে যাও না কেন?

সর্দ্দারের মুখে পুরানো বাঁকা হাসি যেন একবার ফুটিয়া উঠিল, তুমি তো আগে এ ধরনের কথা বলতে না বাবু, এখন বুঝি দিন খুব খারাপ পড়েছে! যা পার ভাব, কিন্তু এ কথা তোমাকে বললে বিশ্বাস করবে যে, আমরা যাদের কাজ করি অথবা যারা আমাদের কাজ করে সকলের সম্বন্ধেই আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি।

মথুর প্রশ্ন করিল, মানে?

বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে সর্দ্দার বলিল, যে এতদিন ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, দেখছ সে সঙ্গে নেই।

—তা তো দেখছি, সে লোকটা গেল কোথায়? তার নামটা কি যেন? ভিখু না?

—সে ধরা পড়েছে।

মথুর চমকাইয়া উঠিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে প্রশ্ন করিল, আরও কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নি তো?

সর্দ্দারের স্বর হতাশাপূর্ণ, তাও ঘটেছে বাবু, ভিখু সব স্বীকার করেছে।

মথুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি স্বীকার করেছে?

হতাশ সর্দ্দার বলিল, অনেক কিছুই। যা বলেছে, তাতেই তোমাকে

আর আমাকে কালাপানি পার হতে হবে। আমি কিন্তু ধরা দিচ্ছি না। রাধাগঞ্জে এই আমার শেষ। তুমি আমাদের ভাল করতে চেয়েছিলে, পাছে কেউ কোনদিন বলে যে তোমার ভাল আমরা করি নি, তাই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দস্যু-সর্দ্দার ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মথুর বাড়ি ফিরিয়া ঘণ্টা দুয়েক ভাবিল—তাহার মনের জোর ছিল, সহজেই সে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল। সে জানিত, পুলিস অর্থলোলুপ, অসৎ; তাহার অর্থের অভাব নাই; পুলিসকে ঘুষ দিয়া সে বশ করিবে। কিন্তু এক জায়গায় একটু গোল ছিল। সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে একজন ধূর্ত্ত অতি চটপটে আইরিশম্যান অধিষ্ঠিত এবং সব কিছু ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করার বদ স্বভাবও তাঁহার ছিল। তিনি প্রায়শই পুলিসের অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মথুর ঘোষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, যেমন করিয়াই হউক সেই অনধিকার-চর্চ্চাকারী আইরিশম্যানের কাছে ভিখুকে দিয়া তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করাইবে।

কে একজন ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করাতে তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতেছে, কাদায় গা মাখামাখি। আগন্তুক জিলাকোর্টে তাহারই নিযুক্ত একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

লোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবু, পালান, আর এক মুহূর্ত্তও দেরি করবেন না।

বিমূঢ় মথুর বলিল, ব্যাপার কি?

—ভিখু নামের কে একজন আজ বেলা এগারোটার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেছে যে, সে কতকগুলি ডাকাতি আর রাহাজানি আপনার কথাতেই করেছে—নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলেছে হুজুর।

মথুর যন্ত্রচালিতের মত বলিল, কি ! ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই স্বীকার করেছে ?—তাহার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

কর্ম্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, স্বীকারোক্তি লেখা হবার পরেই আমি এখানে রওনা হয়েছি ; আমার মনে হচ্ছে রাত্রের মধ্যেই তিনি রাধাগঞ্জে পৌঁছবেন।

মথুর আবার যন্ত্রের মত উচ্চারণ করিল, রাধাগঞ্জে—রাত্রির মধ্যেই।

লোকটি আবার বলিল, পালান হুজুর, শিগগির পালান।

মথুর আবার সেই ভাবেই বলিল, হ্যাঁ, পালাব।

লোকটি চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে সেই ব্যস্তবাগীশ আইরিশম্যান মথুর ঘোষের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং মথুর ঘোষকে হাতে হাতকড়ি পরাইতে। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু বিচিত্র পরিচ্ছদধারী একদল কনস্টবল এবং অসংখ্য জনতা। ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় জীবটি দেখিতে কেমন এবং কি ধরনের খেলা তিনি খেলিতে আসিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া গলা বাড়াইতে লাগিল। মথুর ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।

শেষে মথুর ঘোষকে পাওয়া গেল। গুদাম-মহলের যে ঘরে মাধবকে এবং তাহার মত অন্যান্য অনেককে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, ঠিক সেই ঘরেই স্বয়ং গৃহকর্ত্তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

পরিশিষ্ট

সহৃদয় পাঠক, আমাদের গল্পের সমাপ্তিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পাছে কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলাম না বলিয়া আমাকে দোষী করেন, সেইজন্য এই গল্পের অন্যান্য ব্যক্তিদের কি হইল বলিতেছি।

সর্দার নির্ব্বিবাদে পলায়ন করিল, কিন্তু রাজমোহন পলাইতে পারিল না—ভিখুর স্বীকারোক্তির ফলে সে ভীষণভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, ধৃতও হইয়াছিল। বেকসুর খালাস পাইবার প্রত্যাশায় সেও স্বীকার করিল, কিন্তু অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখাইতে গিয়া পূরা স্বীকার না করায় ভিখু এবং রাজমোহন উভয়কেই দ্বীপান্তরে পাঠানো হইল।

মাধবের গৃহে মাতঙ্গিনী বাস করিতে পারিল না—উভয়েই তাহার কারণ জানিত; সুতরাং তাহার বাবার কাছে সংবাদ পাঠানো হইল। তিনি আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। মাধব তাহার জন্য সেই বৃদ্ধের মাসহারা বৃদ্ধি করিয়া দিল। তাহার জীবন কি ভাবে সমাপ্ত হইল তাহার ইতিহাস নাই, তবে এইটুক জানা যায় যে সে অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তারা তাহার অনুপযুক্ত স্বামীর ভয়ঙ্কর জীবনান্তের কথা নীরবে আজীবন স্মরণ করিত। সে শান্তিতে সুদীর্ঘ বৈধব্য-জীবন কাটাইয়া দিল এবং যখন সে প্রাণত্যাগ করিল, তখন বহুলোকে তাহার জন্য শোক করিল।

মাধব, চম্পক ও অন্যান্য সকলের মধ্যে কেহ কেহ মরিয়াছে এবং বাকি সকলেই মরিবে। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যতের ইতিহাসের উপরও এইটুকু আলোকপাত করিয়া, হে মহোদয় পাঠক, আমি বিদায় লইলাম।